Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

## সিরাহ


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাহিদা আক্তার রুনা

রোলঃ 227022222


৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## রিসার্চের বিষয়ঃ

## সিরাহ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাহিদা আক্তার রুনা

রোলঃ 227022222

Through Knowledge towards Jannah

# Islamic Online Madrasah – IOM

## ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

**প্রত্যয়ন পত্র**

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সিরাহ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাহিদা আক্তার রুনা, আইডিঃ 227022222 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

# ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সিরাহ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Shahida Akter Runa

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

**সাহিদা আক্তার রুনা**

আইডিঃ 227022222

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

## সূচিপত্র

ভূমিকা ....................5
রাসুল ﷺ এর জন্ম ও বংশ পরিচয় ....................5
জন্ম:....................5
বংশ পরিচয়:....................6
পিতার দিক থেকে বংশধারা:....................6
মাতার দিক থেকে বংশধারা:....................7
পিতার মৃত্যু: ....................7
রাসুলুল্লাহ ﷺ এর শৈশবকাল....................7
দুধপান ও লালনপালন: ....................7
দুধমা হালিমার অভিজ্ঞতা:....................8
মাতার ইনতিকাল: ....................9
দাদা ও চাচার তত্ত্বাবধান: ....................9
বকরি চরানো:....................9
ইহুদি পণ্ডিতের সাক্ষাৎ: ....................9
ফিজার যুদ্ধ, হিলফুল ফুজুল, খাদিজা রাঃ এর সাথে বিয়ে ও তার পরিবার.................... 11
ফিজার যুদ্ধ:.................... 11
হিলফুল ফুজুল:.................... 12
খাদিজা রাঃ এর সাথে বিয়ের ঘটনা:.................... 13
রাসুল সাঃ এর অন্যান্য স্ত্রীগণ: .................... 13
রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সন্তানাদি: .................... 14
নবীজির চাচা ও ফুফু:.................... 14
কাবা পুন:নির্মাণ ও হেরা গুহায় নির্জনাবাস .................... 14

কাবাঘর নির্মাণে অংশগ্রহণ: ..... 14
হেরা গুহায় নির্জনাবাস: ..... 15
রাসুলুল্লাহ ﷺ এর উপর ওহী অবতরণ ..... 15
রাসুল ﷺ এর ওপর প্রথম ওহী নাজিল হওয়ার পর দাওয়াতের পর্যায়ক্রমিক বিবরণ ..... 16
১) প্রথম পর্যায়ে ওহী ও গোপন দাওয়াত ..... 16
২) দারুল আরকাম ..... 17
৩) প্রকাশ্যে দাওয়াত ..... 17
৪) প্রকাশ্যে দাওয়াতের পরিণতি ..... 18
মক্কাবাসীর বিরোধিতা, শত্রুতা এবং নবীজির দৃঢ়তা ..... 18
হজযাত্রীদের বাধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত: ..... 19
উতবা ইবনে রাবিয়ার সাথে আলোচনা: ..... 20
কুরাইশদের প্রতিক্রিয়া ..... 21
তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও উপহাস করা: ..... 21
মানসিক নির্যাতন: ..... 22
ইসলামকে বিকৃত করে উপস্থাপন: ..... 22
অত্যাচার-নিপীড়ন: ..... 23
হত্যার পরিকল্পনা: ..... 24
হিজরত ..... 25
প্রথম হিজরত আবিসিনিয়ায়: ..... 25
হিজরতকারীদের জোরপূর্বক ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা : ..... 26
আবিসিনিয়ায় হিজরতের কারণ: ..... 27
হামজা রা. ও উমর রা.এর ইসলাম গ্রহণ ..... 29
হামজা রা. এর ইসলাম গ্রহণ: ..... 29
উমব ইবনু খাত্তাব রা. এর ইসলাম গ্রহণ: ..... 30
বয়কট ..... 31

বয়কটের অবসান: ........ 32
দুঃখের বছর ........ 34
আবু তালিবের মৃত্যু: ........ 34
খাদিজা রাঃ এর মৃত্যু: ........ 35
তায়েফ গমন ........ 36
ইসরা ওয়াল মিরাজ ........ 37
ইসরা: ........ 37
মিরাজ: ........ 38
ইসরা ও মিরাজের পটভূমি: ........ 38
আবু বকর রা: এর ‘সিদ্দীক’ উপাধি লাভ: ........ 41
বিভিন্ন গোত্রের প্রতি আহবান ........ 41
আওস ও খাযরাজের ইসলামে প্রবেশ: ........ 42
আকাবার প্রথম ও দ্বিতীয় বায়আত ........ 44
আকাবার প্রথম বায়আত: ........ 44
আকাবার দ্বিতীয় বায়আত: ........ 45
মদিনায় হিজরতের পটভূমি ........ 46
হিজরতের সূচনা: ........ 46
মদিনায় নবিজির হিজরত: ........ 46
সাওর গুহায় অবস্থান: ........ 47
সাওর গুহা থেকে মদিনার পথে: ........ 48
সুরাকার উপস্থিতি ও তার ঘোড়া মাটিতে ধেবে যাওয়া: ........ 48
উম্মু মাবাদ ও তার স্বামীর ইসলাম গ্রহণ: ........ 49
কুবায় অবতরণ: ........ 49
আলি (রা.) হিজরত ও কুবায় সাক্ষাৎ: ........ 50
হিজরিবর্ষের সূচনা: ........ 50

মদিনায় প্রবেশ:...... 50
মসজিদে নববি নির্মাণ:...... 51
কিবলার পরিবর্তন:...... 51
ইসলামে জিহাদের সূচনা ...... 52
মুজাহিদ বাহিনী গঠন:...... 53
সামরিক অভিযান শুরু: গাজওয়া ও সারিয়া ...... 54
সারিয়ায়ে নাখলা:...... 55
বদর যুদ্ধের প্রেক্ষাপট...... 55
মক্কার কাফেলার পরিকল্পনা:...... 56
সাহাবীদের আত্মত্যাগ: ...... 56
যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং কৌশল: ...... 56
গায়েবি সাহায্য:...... 57
দ্বন্দ্বযুদ্ধের শুরু: ...... 57
সাহাবিদের বিস্ময়কর আত্মত্যাগ:...... 57
রাসুল ﷺ এর দুআ এবং আল্লাহর সাহায্য:...... 58
আবু জাহলকে হত্যা:...... 58
ফেরেশতাদের সাহায্য ও শত্রুদের পরাজিত করা: ...... 59
যুদ্ধবন্দি:...... 60
আবুল আসের ইসলাম গ্রহণ:...... 61
বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের রাঃ মর্যাদা: ...... 62
ইহুদীদের ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনাসমূহ:...... 62
ইসলাম নিয়ে বিদ্রুপ ও তামাশা করা:...... 62
রাসূল সাঃ-এর সাথে বেয়াদবি: ...... 63
ইহুদিরা ছিল মুনাফিক্বদের আধ্যাত্মিক গুরু: ...... 64
ইসলামী দাওয়াহর বিরোধিতা:...... 64

বনু কায়নুকার বিরুদ্ধে অভিযান: .......... 65

কা'ব বিন আশরাফের ঘটনা:.......... 66

বদর ও উহুদের মধ্যবর্তী সামরিক কর্মকাণ্ড .......... 67

১। গাযওয়ায়ে কুদর: .......... 67

২। গাযওয়ায়ে সাওয়ীক:.......... 67

৩। গাযওয়ায়ে যূ আমর/গাযওয়ায়ে গাতফান: .......... 68

৪। সারিয়ায়ে যায়েদ বিন হারিসা: .......... 68

উহুদযুদ্ধ: প্রেক্ষাপট ও প্রস্তুতি .......... 69

সেনাবিন্যাস ও সাহাবিদের জিহাদি স্পৃহা: .......... 69

যুদ্ধ শুরু:.......... 70

তীরন্দাজ বাহিনীর ভুল: .......... 70

রাসূল ﷺ এর উপর হামলা:.......... 71

মুসআব ইবনু উমায়ের রা. এর শাহাদাত: .......... 71

সাহাবীদের আত্মত্যাগ: .......... 72

হানযালাতুল গাসীল এর বীরত্ব ও শাহাদাতঃ.......... 73

হামজা রাঃ এর শাহাদাতঃ.......... 73

উহুদযুদ্ধের শহীদগণ ও হামরাউল আসাদ অভিযান .......... 74

শহীদগণের দাফন:.......... 74

শহীদ ও কাফিরদের নিহতের সংখ্যা:.......... 75

গাযওয়ায়ে হামরাউল আসাদ: .......... 75

আর রাজির মিশন ও বী'রে মা'উনার ট্রাজেডি .......... 76

আর রাজির মর্মান্তিক ঘটনা:.......... 76

বী'রে মা'উনার ট্রাজেডি:.......... 77

বনু নাযীরের বিরুদ্ধে অভিযান.......... 79

বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ ও ইফকের ঘটনা .......... 80

বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ: ........................................................................................................ 80
ইফকের ঘটনা:................................................................................................................ 81
খন্দকযুদ্ধ: প্রেক্ষাপট ও প্রস্তুতি ................................................................................ 82
আল্লাহর পক্ষ হতে প্রথম সাহায্য:................................................................................ 83
আল্লাহর পক্ষ হতে দ্বিতীয় সাহায্য: ............................................................................. 83
হুদায়বিয়ার সন্ধি .......................................................................................................... 84
বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে চিঠি ................................................................................ 85
খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ও আমর ইবনুল আসের ইসলামগ্রহণ:......................................... 86
খাইবার যুদ্ধের কারণ ও প্রেক্ষাপট ............................................................................... 87
কাযা উমরা আদায়: ......................................................................................................... 87
মুতার যুদ্ধ ..................................................................................................................... 87
মুতার যুদ্ধের পটভূমি:.................................................................................................... 87
মুসলিম বাহিনীর প্রস্তুতি:............................................................................................... 88
যুদ্ধক্ষেত্রে সংঘর্ষ: .......................................................................................................... 88
খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ)-এর কৌশল:....................................................................... 88
যুদ্ধের ফলাফল: ............................................................................................................. 88
মক্কাবিজয়: প্রেক্ষাপট ও অভিযান .................................................................................. 89
মক্কাবিজয়ের পর কুরাইশদের সঙ্গে মুসলিমদের আচরণ:............................................... 90
আবু সুফিয়ানের ইসলামগ্রহণ: ........................................................................................ 90
হুনাইনযুদ্ধের প্রেক্ষাপট ................................................................................................ 91
তায়েফযুদ্ধ...................................................................................................................... 92
গাজওয়ায়ে তাবুক বা তাবুকযুদ্ধ ..................................................................................... 92
কয়েকটি মুজিজা:............................................................................................................ 93
মসজিদে জিরারে অগ্নিসংযোগ:...................................................................................... 94
প্রতিনিধিদলের আগমন এবং দলে দলে লোকজনের ইসলামে প্রবেশ ............................... 94

বনু সাকিফের প্রতিনিধিদল:........................................................................................ 94
বনু ফাজারার প্রতিনিধিদল:........................................................................................ 94
বনু তামিমের প্রতিনিধিদল:........................................................................................ 95
বনু সাআদ ইবনু বকরের প্রতিনিধিদল:........................................................................ 95
বনু আবদুল কায়েসের প্রতিনিধিদল: ............................................................................ 95
বনু হানিফের প্রতিনিধিদল:........................................................................................ 95
আবু বকরকে হজের আমির নির্ধারণ :.......................................................................... 95
হুজ্জাতুল ইসলাম বা বিদায়হজ...................................................................................... 96
রাসূলুল্লাহর ﷺ হজ্জ: .................................................................................................. 96
বিদায়হজের ভাষণ:...................................................................................................... 96
সারিয়ায়ে উসামা ইবনু যায়েদ: .................................................................................... 97
নবীজির ﷺ অসুস্থতা ও ইনতিকাল................................................................................ 97
আবু বকরের ইমামতি:................................................................................................. 98
নবীজির ﷺ শেষ ভাষণ:.............................................................................................. 98
নবীজির ﷺ শেষ কথা:.............................................................................................. 100
তথ্যসূত্র..................................................................................................................... 102

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

# ভূমিকা

সিরাত শব্দটি আরবি "সীরাহ" থেকে এসেছে, যার অর্থ জীবনপথ বা জীবনচরিত। এটি মহানবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের ইতিহাস এবং তাঁর প্রদর্শিত আদর্শের বিস্তারিত বিবরণ। সিরাত অধ্যয়ন আমাদেরকে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনযাপনের পদ্ধতি, তাঁর সৎ কর্ম এবং আল্লাহর প্রতি তাঁর অটুট বিশ্বাসের শিক্ষা দেয়।

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীবন। তাঁর চরিত্র ও আচার-আচরণ মানবতা ও নৈতিকতার আদর্শ। সিরাত অধ্যয়ন আমাদের ঈমান শক্তিশালী করতে সাহায্য করে এবং ইসলামের বিভিন্ন বিধান এবং কুরআনের আয়াতের বাস্তব চিত্র উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। রাসুল (সা.)-এর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের জন্য শিক্ষা ও দিকনির্দেশনার উৎস।

সিরাত আমাদেরকে শুধুমাত্র ইতিহাস শেখায় না, বরং আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যথাযথ পথ প্রদর্শন করে। মহানবী (সা.)-এর জীবন কুরআনের প্রতিফলন, এবং তাঁর আচরণ আমাদের সকলের জন্য অনুকরণীয়। এই প্রেক্ষাপটে, সিরাত অধ্যয়ন মুসলমানদের জীবনে অপরিহার্য, কারণ এর মাধ্যমে আমরা ইসলামী জীবনযাপনের সত্যিকারের অর্থ এবং বাস্তব প্রয়োগ বুঝতে পারি।

## রাসুল ﷺ এর জন্ম ও বংশ পরিচয়

### জন্ম:

আমুল ফীল বা হস্তীবর্ষের বছর, সোমবার সুবহে সাদিকের সময়, মক্কার সম্মানিত বনু হাশিম বংশে রাসুলুল্লাহ ﷺ জন্মগ্রহণ করেন। এই বছর ইতিহাসের একটি স্মরণীয় ঘটনা ঘটে—ইয়েমেনের রাজা আব্রাহা কাবা ধ্বংসের উদ্দেশ্যে বিশাল হাতি বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করলে, আল্লাহ তাআলা আবাবিল পাখির মাধ্যমে তাদের ধ্বংস করে দেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর জন্মের নির্দিষ্ট তারিখ নিয়ে সীরাহবিদদের মধ্যে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। তবে অধিকাংশ সীরাহবিদের মতে, তিনি ১২ রবিউল আউয়াল জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর জন্মের সংবাদ পেয়ে দাদা আব্দুল মুত্তালিব আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছুটে আসেন। তিনি নবজাতককে কোলে তুলে কাবাঘরের সামনে নিয়ে যান, আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন এবং দোয়া করেন। এরপর তিনি নাম রাখেন *"মুহাম্মাদ"*, যার অর্থ "প্রশংসিত"। এটি আরব সমাজে নতুন ও ব্যতিক্রমী একটি নাম ছিল।

## বংশ পরিচয়:

রাসুলুল্লাহ ﷺ আরবের সবচেয়ে সম্মানিত বংশ বনু হাশিমে জন্মগ্রহণ করেন। এটি ছিল কুরাইশ গোত্রের একটি শাখা, যারা কাবা শরিফের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করত। তিনি ছিলেন ইসমাইল (আ.)-এর বংশধর, যিনি ছিলেন ইব্রাহিম (আ.)-এর পুত্র।

তাঁর বংশ মর্যাদা সম্পর্কে এমনকি কাফের কুরাইশরাও স্বীকার করত। রাসুলুল্লাহ ﷺ এক হাদিসে বলেছেন:

*"আল্লাহ ইসমাইল (আ.)-এর সন্তানদের থেকে কিনানাকে, কিনানা থেকে কুরাইশকে, কুরাইশ থেকে বনু হাশিমকে, এবং বনু হাশিম থেকে আমাকে নির্বাচিত করেছেন।" (সহিহ মুসলিম: ২২৭৬)*

## পিতার দিক থেকে বংশধারা:

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পিতার দিক থেকে বংশধারা হলো:
মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশিম বিন আব্দে মানাফ বিন কুসাই বিন কিলাব বিন মুররাহ বিন কা'ব বিন লুওয়াই বিন গালিব বিন ফিহর (যাঁর নামানুসারে কুরাইশ নামকরণ হয়) বিন মালিক বিন নাযার বিন কিনানাহ বিন খুযায়মাহ বিন মুদরিকা বিন ইলিয়াস বিন মুযার বিন নিযার বিন মা'আদ্দ বিন আদনান।

আদনান পর্যন্ত বংশধারা নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণিত। আদনান ছিলেন ইসমাইল (আ.)-এর বংশধর। আদনান থেকে ইসমাইল (আ.) পর্যন্ত নির্ভুল বংশধারা জানা যায় না।

## মাতার দিক থেকে বংশধারা:

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মায়ের দিক থেকে বংশধারা হলো:
মুহাম্মাদ বিন আমিনা বিনতে ওয়াহাব বিন আব্দে মানাফ বিন যুহরাহ বিন কিলাব।

পিতা ও মাতার বংশ কিলাব পর্যন্ত মিলিত হয়ে এক হয়।

## পিতার মৃত্যু:

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পিতা আব্দুল্লাহ ছিলেন এক উদার ও সম্মানিত ব্যক্তি। তিনি ব্যবসায়িক সফরে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। সফর শেষে মদিনার কাছে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সেখানেই ইন্তিকাল করেন। তাঁকে মদিনায় দাফন করা হয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ তখন মায়ের গর্ভে ছিলেন। জন্মের আগেই তাঁর পিতৃহারা হওয়ার ঘটনা তাঁর জীবনের প্রথম কঠিন পরীক্ষা ছিল।

## রাসুলুল্লাহ ﷺ এর শৈশবকাল

## দুধপান ও লালনপালন:

রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রথম জীবনে লালিত-পালিত হন তাঁর মা আমিনা এবং উম্মে আইমান বারাকার হাতে। উম্মে আইমান ছিলেন রাসুল ﷺ এর পিতার পরিচারিকা এবং পরবর্তীতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসুল ﷺ তাঁকে স্বাধীন করে দেন এবং যায়েদ ইবনু হারিসার সঙ্গে বিয়ে দেন।

রাসুল ﷺ-এর জন্মের পর প্রথমে তাঁর সম্মানিত মাতা আমিনা তাঁকে দুধ পান করান। এরপর চাচা আবু লাহাবের দাসী সুওয়াইবা রা. তাঁকে দুধ পান করান। পরে তাঁকে গ্রহণ করেন বনু সাদের হালিমা সাদিয়া রা., যিনি রাসুল ﷺ এর দুধমা হিসেবে খ্যাত।

তৎকালীন আরবের প্রথা ছিল শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য মরুভূমিতে পাঠানো। রাসুল ﷺ-ও এই নিয়ম অনুসারে দুধমা হালিমার কাছে বেড়ে উঠেন।

হালিমা সাদিয়া রা. বলেন, এক দুর্ভিক্ষের সময়ে তিনি শিশু মুহাম্মাদ ﷺ-কে দুধপানের জন্য গ্রহণ করেন। মুহাম্মাদ ﷺ-এর আগমনের পরপরই তাঁর গৃহে দারুণ বরকত শুরু হয়। তিনি লক্ষ্য করেন, তাঁর স্তনে পর্যাপ্ত দুধ এবং পরিবারের উট ও গাধা সবল হয়ে উঠেছে।

## দুধমা হালিমার অভিজ্ঞতা:

হালিমা সাদিয়া রা. তাঁর স্বামী এবং অন্যান্য নারী বান্ধবীদের সঙ্গে মক্কায় এসে পৌঁছান, সেখানে তাঁরা শিশুদের খোঁজে বের হন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, তারা যে এতদূর থেকে এসেছেন, তাদের একজন সন্তান পেলে তারা উপকৃত হবেন এবং তাদের জীবনযাত্রার অবস্থাও উন্নত হবে। কিন্তু তাঁদের জন্য প্রথমে কারো সন্তান পাওয়া সহজ ছিল না, কারণ সে বছর মক্কায় মহামন্দা এবং খাদ্যাভাব ছিল। বেশিরভাগ গৃহস্থরা তাঁদের ইয়াতিম শিশুকে গ্রহণ করতে চায়নি।

তবে, একসময় হালিমা সাদিয়া রা. তাঁর স্বামীকে বললেন, "আমি মুহাম্মদ ﷺ কে নিব। এমনকি, যদিও তিনি ইয়াতিম (অবহেলিত) তবে তাঁর সাথে আমাদের ভাগ্য ভালো হবে।"

অতঃপর, হালিমা সাদিয়া রা. মুহাম্মদ ﷺ কে গ্রহণ করতে সম্মত হন। তিনি উল্লেখ করেছেন, "যখন আমি মুহাম্মদ ﷺ কে নিলাম, তখন আমি উপলব্ধি করলাম যে এই শিশুর মধ্যে কিছু আলাদা ব্যাপার রয়েছে।" এর পর থেকে তাঁর গৃহে এক অলৌকিক বরকত চলে আসে।

রাসুল ﷺ হালিমা সাদিয়া রা. এর গৃহে আসার পর বিভিন্ন বরকত দেখা দেয়। তাঁর গাধা, যা আগে দুর্বল ছিল, শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং তাদের উটের দুধও এখন পূর্ণ হয়ে যায়। এটা ছিল আল্লাহর একটি অদৃশ্য সাহায্য, যা রাসুল ﷺ এর আগমনের পর আল্লাহ তাঁর পরিবারকে দিয়েছিলেন। হালিমা সাদিয়া রা. বলেন, "এটি আল্লাহর বরকত ছিল, কারণ আমি যে শিশুটিকে নিয়েছিলাম, তাঁর জন্য আমাদের সংসারে দারিদ্র্য চলে গিয়েছিল।"

দুই বছর পর, হালিমা সাদিয়া রা. রাসুল ﷺ কে দুধ ছাড়িয়ে দেয়। তবে, তিনি এবং তাঁর স্বামী এতটাই উপকৃত হন যে তাঁরা আরও কিছু সময় মুহাম্মদ ﷺ কে নিজেদের কাছে রাখার জন্য তাঁর মায়ের অনুমতি চেয়েছিলেন।

একদিন, রাসুল ﷺ যখন খেলছিলেন, তাঁর দুধ-ভাই এসে তাঁকে জানায় যে কিছু লোক এসে তাঁর বুক চিরে দিয়েছে। হালিমা সাদিয়া রা. এবং তাঁর স্বামী আতঙ্কিত হয়ে মক্কায় ফিরে যান এবং রাসুল ﷺ এর মা আমিনাকে জানিয়ে দেন, "এই শিশুর ক্ষেত্রে কিছু ঘটেছে। আমরা আর তাঁর দায়িত্ব নিতে পারব না।"

## মাতার ইনতিকাল:

ছয় বছর বয়সে রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর মাতা আমিনা কে হারান। মদিনায় আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা করে ফেরার পথে ‘আবওয়া’ নামক স্থানে তিনি ইন্তেকাল করেন। সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

## দাদা ও চাচার তত্ত্বাবধান:

মাতার ইন্তেকালের পর দাদা আব্দুল মুত্তালিব রাসুল ﷺ-এর দায়িত্ব নেন। তিনি রাসুল ﷺ-কে অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং প্রিয় সন্তানদের তুলনায় তাঁকে বেশি মর্যাদা দিতেন।

রাসুল ﷺ যখন আট বছর বয়সে পৌঁছান, তখন দাদাও ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর আগে তিনি রাসুল ﷺ-এর দায়িত্ব তাঁর চাচা আবু তালিবকে দিয়ে যান। আবু তালিবও তাঁকে নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসতেন এবং প্রতিটি বিপদে তাঁকে আগলে রাখতেন।

## বকরি চরানো:

রাসুল ﷺ এর শৈশবের কিছু সময় তাঁর চাচা আবু তালিবের অধীনে অতিবাহিত হয়। আবু তালিব আর্থিকভাবে সচ্ছল ছিলেন না, তবে তিনি রাসুল ﷺ এর প্রতি অগাধ ভালোবাসা ও মমতা পোষণ করতেন। শৈশবে, রাসুল ﷺ এর পরিবারকে সহযোগিতা করতে এবং পরিবারের আর্থিক পরিস্থিতি কিছুটা উন্নত করতে, রাসুল ﷺ কে বকরি চরানোর জন্য পাঠানো হয়।

রাসুল ﷺ নিজেই বর্ণনা করেছেন, “আল্লাহর প্রেরিত সকল নবীই বকরি চরিয়েছেন।” সাহাবি হজরত উমর (রা) একদিন রাসুল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আপনি কি বকরি চরিয়েছেন?" রাসুল ﷺ বলেছিলেন, "হ্যাঁ, আমি এক কিরাতের বিনিময়ে মক্কাবাসীর বকরি চরিয়েছি।”

## ইহুদি পণ্ডিতের সাক্ষাৎ:

রাসুল ﷺ তখন মাত্র বারো বছর বয়সে ছিলেন। তাঁর চাচা আবু তালিব তাঁকে সঙ্গে নিয়ে শাম গমন করেছিলেন। সেখানে তারা বসরা নামক শহরে পৌঁছান। বসরায় বাস করতেন একজন পাদ্রী, যাঁর নাম ছিল "বাহীরা"। তিনি ছিলেন একজন পণ্ডিত এবং ইহুদী ধর্মের বিশেষজ্ঞ। বাহীরা তাঁর ধর্মীয় গ্রন্থ এবং ইঞ্জিল সম্পর্কে খুবই অভিজ্ঞ ছিলেন।

যখন আবু তালিবের কাফেলা বসরায় পৌঁছায়, তখন বাহীরা পাদ্রী তার ইবাদতখানা থেকে বের হয়ে এসে কাফেলার দিকে নজর দেন। তিনি এই কাফেলা দেখে বেরিয়ে আসেন কারণ তিনি একটি বিশেষ অনুভূতি পেতে শুরু করেন। বাহীরা দেখেছিলেন, কাফেলার আগমনকালীন সময়ে চারপাশের গাছপালা এবং শিলাখণ্ডেরা বালক মুহাম্মাদ ﷺ এর প্রতি সিজদা করতে শুরু করেছিল। এটি ছিল একটি অস্বাভাবিক ঘটনা, এবং কোনো সাধারণ ব্যক্তি বা অধমের পক্ষে এমনটা হওয়া সম্ভব ছিল না। বাহীরা খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলেন এবং তিনি বুঝতে পারলেন যে, এই বালকই একদিন আখিরাতের নবী হিসেবে আবির্ভূত হবেন

বাহীরা পাদ্রী এই ঘটনা দেখে আবু তালিবের কাছে আসেন এবং তাঁকে জানিয়ে দেন, “এই বালককে একটি বিশেষ মহিমা দিয়ে পাঠানো হয়েছে। আমি নিশ্চিত, এটি সেই নবী, যার আগমনকে পূর্ববর্তী ধর্মীয় গ্রন্থে ঘোষণা করা হয়েছিল। আপনি যদি তাকে ভবিষ্যতে ক্ষতি না চান, তবে তাকে মক্কায় ফিরিয়ে পাঠিয়ে দিন। এখানে সে ইহুদী ও রোমানদের শত্রুতার মুখোমুখি হতে পারে।"

বাহীরা আরো বলেন, "আমি দেখেছি তার কাঁধে একটি বিশেষ চিহ্ন রয়েছে, যা নবুওয়াতের মোহর। এছাড়া, কিছু বিশেষ গুণ রয়েছে, যা তার মধ্যে রয়েছে, যা শুধুমাত্র একজন নবীর মধ্যে থাকতে পারে।"

বাহীরা যখন আবু তালিবকে সতর্ক করেন, তখন আবু তালিব প্রশ্ন করেন, "কেন আপনি এমনটা বলছেন?" বাহীরা বিস্তারিত জানিয়ে বলেন, "এটি একটি বিশেষ ঘটনা, এবং আমি নিশ্চিত যে, এটি ভবিষ্যতের একজন নবী হওয়ার ইঙ্গিত। আপনি যদি তাকে আরও বিপদে ফেলতে চান, তবে তাকে শাম থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসুন। এখানে ইহুদী এবং রোমানরা তাকে সনাক্ত করতে পারবে এবং তারা তাকে মেরে ফেলতে পারে।" আবু তালিব বাহীরার কথা শোনার পর, খুব সতর্কতার সঙ্গে রাসুল ﷺ কে মক্কায় ফেরত পাঠিয়ে দেন।

# ফিজার যুদ্ধ, হিলফুল ফুজুল, খাদিজা রাঃ এর সাথে বিয়ে ও তার পরিবার

## ফিজার যুদ্ধ:

ফিজার যুদ্ধ ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যা কুরাইশ ও ক্বায়স আয়লানের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। এই যুদ্ধের শুরু ছিল এক তিক্ত ঘটনা থেকে। বনু কিনানার এক ব্যক্তি, বাররায, ক্বায়স আয়লানের তিনজন লোককে হত্যা করে। এর প্রতিশোধ নিতে হাওয়াযিন গোত্রের সদস্যরা বনু কিনানাকে আক্রমণ করে। বনু কিনানার কিছু সদস্য কুরাইশের সাথে মিত্রতা স্থাপন করে এবং তারা প্রাণ বাঁচানোর জন্য মক্কার পবিত্র ভূমি, হারামের সীমানায় আশ্রয় নেয়। তবে হাওয়াযিনের লোকেরা তাদের পিছু ছেড়ে হারামের মধ্যেও আক্রমণ চালায়। ফলে, কুরাইশ এবং ক্বায়স আয়লানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

যুদ্ধের প্রথমে কুরাইশরা অত্যন্ত দুর্বল অবস্থানে ছিল, তবে ধীরে ধীরে তারা তাদের শক্তি পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয় এবং ক্বায়স আয়লানদের জন্য পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকে। যুদ্ধের এক পর্যায়ে কুরাইশরা সন্ধির প্রস্তাব দেয়, যাতে শর্ত ছিল, যে পক্ষের বেশি লোক নিহত হয়েছে, তাদের অতিরিক্ত নিহতদের রক্তপণ হিসেবে দিতে হবে। উভয় পক্ষ এই শর্ত মেনে নেয় এবং যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়।

এ যুদ্ধের একটি বিশেষ গুরুত্ব ছিল, কারণ এটি হারাম শরিফের পবিত্রতার লঙ্ঘন ঘটেছিল। হারাম শরিফ ছিল সমগ্র আরববাসীর কাছে অত্যন্ত সম্মানিত স্থান, যেখানে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা নিষিদ্ধ ছিল। আরবরা হারাম শীল ও সুরক্ষিত স্থান হিসেবে একে মেনে চলত। তবে, এই যুদ্ধের মাধ্যমে হারামের পবিত্রতা ভঙ্গ করা হয়, তাই এই যুদ্ধে 'হারবুল ফিজার' (ফিজার যুদ্ধ) নামে অভিহিত করা হয়।

রাসুল ﷺ সরাসরি এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি, তবে তিনি তার চাচাদের তীর কুড়িয়ে দিয়ে কিছু সাহায্য করেছিলেন। এর মাধ্যমে তিনি যুদ্ধের ক্ষতি এড়িয়ে গিয়ে একজন অনুগত সহকারী হিসেবে নিজের দায়িত্ব পালন করেন।

# হিলফুল ফুজুল:

হিলফুল ফুজুল ছিল একটি ঐতিহাসিক চুক্তি, যা মক্কায় একটি অশান্ত পরিস্থিতির পর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এটি মক্কার সমাজে ন্যায় ও সহানুভূতির প্রতিষ্ঠা করেছিল।

এটির পটভূমি ছিল এক মর্মান্তিক ঘটনা। একদিন, একটি গোত্রের সদস্য, জাবিদ নামে একজন ব্যবসায়ী, কিছু পণ্য নিয়ে মক্কায় আসে। আস ইবনু ওয়াইল নামে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির কাছে তিনি তার পণ্য বিক্রি করেন, তবে আস ইবনু ওয়াইল পণ্যের মূল্য পরিশোধ করতে অস্বীকার করেন। জাবিদ এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে মক্কার অভিজ্ঞানী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছে সাহায্য চাইলে কেউ তার সহায়তায় এগিয়ে আসেনি।

বিষয়টি এতটাই গুরুতর হয়ে দাঁড়ায় যে, জাবিদ মক্কার কাবা প্রাঙ্গণে গিয়ে সবার সামনে তার অভিযোগ উত্থাপন করেন। তিনি উচ্চস্বরে বলেন, "হে মক্কাবাসী, আমি এখানে এসে যুলুমের শিকার হয়েছি। আমার অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার জন্য কে দাঁড়াবে?" তার আবেগপূর্ণ এই আহ্বান শুনে কুরাইশের কিছু গোত্রের নেতারা একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেন যে, মক্কায় কোনো ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে নিপীড়িত করা যাবে না।

এই দলটি এক চুক্তি সম্পাদন করে যার মাধ্যমে তারা মক্কার দুর্বল ও নিপীড়িত মানুষের অধিকার রক্ষার অঙ্গীকার করেন। এ চুক্তির নাম ছিল হিলফুল ফুজুল, যার অর্থ 'অত্যাচার প্রতিরোধের চুক্তি'। চুক্তির মূল উদ্দেশ্য ছিল অন্যায় ও জুলুমের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা।

রাসুল ﷺ তখন তরুণ ছিলেন এবং এই চুক্তিতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এতে স্বাক্ষর করেন এবং এতে যোগদান করেন। পরবর্তীতে তিনি বলেছেন, "আমি যদি এই চুক্তির মতো এমন একটি চুক্তি বর্তমান জীবনে আবার দেখি, তবে আমি এতে অংশগ্রহণ করব।" এটি প্রমাণ করে যে, রাসুল ﷺ ন্যায় ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন, যা তার জীবনের মূল নীতির একটি অংশ ছিল।

হিলফুল ফুজুল চুক্তির মাধ্যমে মক্কায় এক সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টি হয়, যেখানে সমাজের অধিকারহীন শ্রেণির প্রতি সহানুভূতি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়।

## খাদিজা রাঃ এর সাথে বিয়ের ঘটনা:

খাদিজা বিনতু খুওয়াইলিদ রাঃ ছিলেন মক্কার একজন  ধনী ও সফল ব্যবসায়ী মহিলা। তিনি ব্যবসার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তিকে কাজে নিয়োগ দিতেন। একবার তিনি শুনলেন যে, মক্কার যুবক মুহাম্মদ ﷺ  একজন অত্যন্ত সৎ, খোলামেলা, এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তি। তাঁর সততা, সত্যবাদিতা এবং সুন্দর চরিত্রের কথা অনেকের কাছ থেকে শুনে তিনি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। খাদিজা রাঃ তখন তাঁর ব্যবসার জন্য শামের উদ্দেশে একজন বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী পাঠাতে চাচ্ছিলেন। তিনি রাসুল ﷺ কে তাঁর ব্যবসায় নিযুক্ত করার প্রস্তাব দেন এবং বলেন, "তুমি আমার পণ্য নিয়ে শামের উদ্দেশে যাত্রা করো। যদি তুমি আমার পণ্য বিক্রি করতে যাও, আমি তোমাকে পুরস্কৃত করব।"

রাসুল ﷺ তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং খাদিজার গোলাম মায়সারা সহ শামের দিকে যাত্রা করেন। শামে পৌঁছে রাসুল ﷺ তাঁর পণ্যগুলি বিক্রি করেন এবং লাভের পরিমাণও অনেক বেশি হয়। তিনি শামের বাজার থেকে নতুন পণ্যও কিনে মক্কায় ফিরে আসেন। খাদিজা রাঃ তাঁর ব্যবসায়িক লাভ দেখে অভিভূত হন এবং মায়সারার কাছ থেকে রাসুল ﷺ সম্পর্কে আরো জানতে চান। মায়সারা তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বলেন, "মুহাম্মদ ﷺ এক অতি সৎ, বিশ্বস্ত এবং ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি।"

মায়সারার মুখে এই সকল প্রশংসা শুনে খাদিজা রাঃ গভীরভাবে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন। এরপর তিনি নিজেই রাসুল ﷺ কে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। খাদিজা রাঃ ছিলেন ৪০ বছর বয়সী, এবং রাসুল ﷺ ছিলেন ২৫ বছর বয়সী, তবে তাঁদের মধ্যে বয়সের পার্থক্য কখনোই তাঁদের সম্পর্কের গভীরতা এবং সৌন্দর্যে কোনো বাধা সৃষ্টি করেনি। রাসুল ﷺ খাদিজা রাঃ এর প্রস্তাব মেনে নেন এবং তাঁরা বিয়ে করেন। খাদিজা রাঃ ছিলেন প্রথম মুসলিম মহিলা, যিনি রাসুল ﷺ এর প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখেছিলেন এবং ইসলামের পথে তার প্রথম সহযাত্রী ছিলেন।

## রাসুল সাঃ এর অন্যান্য স্ত্রীগণ:

খাদিজা রা. ইনতিকালের পর নবিজি আরও কয়েকজন সচ্চরিত্র মহিলাকে বিয়ে করেন। তাঁরা হচ্ছেন : ২. সাওদা বিনতু জামআ রা., ৩. আয়েশা বিনতু আবু বকর, ৪. হাকসা বিনতু উমর, ৫. জায়নাব বিনতু খুজায়মা, ৬. উম্মু সালামা, ৭. জায়নাব বিনতু জাহাশ ৮. জুওয়াইরিয়া, ৯. উম্মু হাবিবা, ১০. সাফিয়া, ১১. মাইমুনা রাদ্বিআল্লাহু আনহুম।

## রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সন্তানাদি:

রাসুল ﷺ এর ছয়জন সন্তান খাদিজা রাঃ এর গর্ভে জন্ম নেন, যাদের মধ্যে চারজন মেয়ে এবং দুইজন ছেলে ছিলেন। ছেলে দুইজনের নাম কাসিম ও তাহির। কাসিমের নামানুসারে নবীজির উপনাম ছিল 'আবুল কাসিম'। মেয়ে চারজনের নাম: ১) ফাতিমা ২) জায়নাব ৩) রুকাইয়া ও ৪) উম্মু কুলসুম রা.

নবীজির সকল সন্তানই খাদিজা রাঃ এর গর্ভজাত। তবে ইব্রাহিম নামে তাঁর তৃতীয় সন্তান ছিল, যিনি মারিয়া কিবতিয়া রা. এর গর্ভে জন্মান। তাঁর এই তিন পুত্রসন্তানের সকলে শৈশবে ইনতিকাল করেন।

## নবীজির চাচা ও ফুফু:

নবীজির ﷺ দাদা আব্দুল মুত্তালিবের ১০ জন পুত্রসন্তান ছিলেন:

১. হারিস ২. জুবায়ের ৩. হুজাল ৪. জিরার ৫. মুকাওয়িম ৬. আবু লাহাব ৭. আব্বাস রা. ৮. হামজা রা. ৯. আবু তালিব ১০. আবদুল্লাহ

তাঁদের মধ্যে আবদুল্লাহ হচ্ছেন নবীজির সম্মানিত পিতা, আর বাকি নয়জন হলেন চাচা। চাচাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ছিলেন আব্বাস রা.।

নবীজির ফুফু ছিলেন ছয়জন:

১. উমায়মা ২. উম্মু হাকিম ৩. বাররা ৪. আতিকা ৫. সাফিয়া ৬. আরওয়া।

# কাবা পুন:নির্মাণ ও হেরা গুহায় নির্জনাবাস

## কাবাঘর নির্মাণে অংশগ্রহণ:

রাসুল ﷺ এর বয়স যখন ৩৫ বছর, তখন মক্কার কুরাইশরা সিদ্ধান্ত নেন যে তারা কাবাঘর পুনঃনির্মাণ করবেন। কাবাঘরের কিছু অংশ আগুনে পুড়ে গিয়েছিল এবং বন্যায় দেয়ালগুলি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তখনো পর্যন্ত কাবাঘর ইবরাহীম আ.-এর তৈরি অবকাঠামোর উপর ছিল। পুনঃনির্মাণের জন্য কাবাঘরের পুরনো ইমারতটি ভেঙে ফেলার প্রয়োজন পড়েছিল, কিন্তু কেউ সাহস পাচ্ছিল না। কুরাইশরা তাদের সব যন্ত্রপাতি নিয়ে কাবার চারপাশে অপেক্ষা করছিল, কিন্তু তারা চিন্তা করছিল যে, এই কাজটি যদি তারা শুরু করেন, তবে আল্লাহর রাগে বিপদে পড়তে পারেন। অবশেষে, একজন ব্যক্তি বললেন, "আমি কাজটি শুরু করবো," এবং পরদিন ভোরে কাবার পাথরগুলো সরাতে শুরু করেন। তাদের মধ্যে তখন এক তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয়, বিশেষত হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) বসানোর বিষয়ে। এ নিয়ে সবাই চাইছিল যে, তারা এই কাজটি করবে।

এত তর্কবিতর্কের পর, তারা একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মসজিদের দরজা দিয়ে প্রথম যে ব্যক্তি প্রবেশ করবেন, তিনি এই বিরোধ মীমাংসা করবেন। পরদিন, রাসুল ﷺ প্রথম মসজিদের দরজা দিয়ে প্রবেশ করেন এবং তাকে দেখামাত্র সবাই একসঙ্গে বলেন, "এ হলেন আল-আমিন (বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি), আমরা তার সিদ্ধান্ত মেনে নেবো।" রাসুল ﷺ তখন বিচক্ষণতার সাথে হাজরে আসওয়াদ পাথরটি বসানোর ব্যবস্থা করেন। তিনি একটি চাদর বিছিয়ে তাতে পাথরটি রেখে প্রত্যেক গোত্রের ব্যক্তিকে চাদরের কোণ ধরে সেটি স্থানান্তর করতে বলেন। পরে, তিনি নিজে হাতে পাথরটি নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়ে দেন।

## হেরা গুহায় নির্জনাবাস:

রাসুল ﷺ এর বয়স যখন ৪০ বছর, তখন তাঁর মন ও চিন্তা ক্রমে আল্লাহর প্রতি গভীর আস্থায় পূর্ণ হয়ে ওঠে। তিনি সাধারণ জীবনযাত্রা থেকে একদম আলাদা হতে শুরু করেন এবং তাঁর মন যেন সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্য চায়। একমাত্র আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কের এক গভীর আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর মধ্যে। এজন্য তিনি হেরা গুহায় নির্জন বাসে আগ্রহী হন। রাসুল ﷺ সেখানে বহু দিন একা একা কাটাতেন। তিনি আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ করতেন এবং তাঁর অন্তরে এক ধরনের অভ্যন্তরীণ শান্তি অনুভব করতেন। এই সময়ের মধ্যে আল্লাহর সৃষ্টির দিকে গভীরভাবে নজর দিতেন। যখন তাঁর প্রয়োজনীয় রসদ শেষ হয়ে যেত, তখন তিনি আবার মক্কায় ফিরে আসতেন। পরিবারের কাছে কিছু প্রয়োজনীয় খাবার এবং পানীয় সংগ্রহ করতেন এবং আবার গুহায় ফিরে যেতেন। এভাবে তিনি নির্জন অবস্থায় আল্লাহর সান্নিধ্যে সময় কাটাতেন, আর ধীরে ধীরে নবুওয়াতের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে থাকতেন।

## রাসুলুল্লাহ ﷺ এর উপর ওহী অবতরণ

এভাবেই একদিন, রমজান মাসে আল্লাহর প্রেরিত ফেরেশতা জিবরীল আঃ রাসুল ﷺ এর কাছে আসেন। হেরা গুহায় এই প্রথম ওহী অবতীর্ণ হয়। জিবরীল আঃ রাসুল ﷺ কে বলেন, "তুমি পড়ো"। রাসুল ﷺ উত্তর দেন, "আমি পড়তে জানি না"। এরপর জিবরীল আঃ তাঁকে শক্তভাবে আলিঙ্গন করে বলেন, “তুমি পড়ো”। রাসুল ﷺ এবারো বললেন, “আমি পড়তে জানি না”। পুনরায় জিবরীল আঃ তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিয়ে বললেন, ‘ইক্বরা।’

“পড়ুন আপনার রবের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে। পড়ুন আপনার প্রতিপালক মহা দয়ালু। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে (এমন জ্ঞানের), যা সে জানতো না।” ( সূরা আলাক, ৯৬:১-৫)

ওহী গ্রহনের পর, রাসুল ﷺ অত্যন্ত অস্থির চিত্তে গুহা থেকে বাড়ি ফিরে আসেন। তিনি খাদিজা রাঃ কে বলেন, “আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও।” খাদিজা রাঃ তাঁকে শুইয়ে দিলেন এবং কিছুক্ষণ পর স্বাভাবিক হলে তিঁনি খাদিজা রাঃ এর কাছে সব কথা খুলে বললেন।

খাদিজা রাঃ সব শুনে তাঁর স্বামীকে আশ্বস্ত করে বললেন, “আল্লাহ আপনাকে কখনো অপমানিত করবেন না, কেননা আপনি তো আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন, মিসকিনদের সাহায্য করেন, মেহমানদারি করেন, সত্যের পথে থাকা মানুষদের সহযোগিতা করেন। আপনার সাথে যা ঘটেছে তা কখনোই শয়তানের পক্ষ থেকে হতে পারে না।”

খাদিজা রাঃ নবীজিকে নিয়ে তাঁর চাচাতো ভাই ওয়াকার ইবনু নাওফিল এর কাছে যান। ওয়াকার ছিলেন একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি এবং তিনি আগে কিছু অংশ বাইবেল পড়েছিলেন। তিনি ঘটনাটি শুনে বলেন, “এটাই সেই ফেরেশতা, যাকে আল্লাহ মূসা আ. এর কাছে পাঠিয়েছিলেন। হায়, যদি আমি জীবিত থাকতাম! যদি আমি যুবক থাকতাম, তাহলে তোমার ক্বওম তোমাকে বের করে দিবে!” রাসুল ﷺ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন, “তাহলে কি তারা আমাকে দেশ থেকে বের করে দিবে?” ওয়াকার উত্তরে বলেন, “হ্যাঁ, তারা আপনাকে বের করে দেবে। অতীতে বহু নবীকে তাদের কওম এমনকি দেশ থেকেও বের করে দিয়েছে।” কিছু দিন পর ওয়াকার মৃত্যুবরণ করেন।

## রাসুল ﷺ এর ওপর প্রথম ওহী নাজিল হওয়ার পর দাওয়াতের পর্যায়ক্রমিক বিবরণ

### ১) প্রথম পর্যায়ে ওহী ও গোপন দাওয়াত

রাসুল ﷺ এর ওপর প্রথম ওহী নাজিল হওয়ার সময়, তাঁকে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের জন্য আদিষ্ট করা হয়নি। তখন শুধু তাঁর ব্যক্তিগত বিষয় সম্পর্কিত বিধান নাজিল হচ্ছিল। কিছুদিন পর যখন ওহী নাজিলের ধারাবাহিকতা ফিরে আসে, তখন আল্লাহ তাআলা রাসুল ﷺ কে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার নির্দেশ দেন। প্রাথমিকভাবে, ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য একটি

ছোট দল তৈরি করার প্রয়োজন ছিল যারা ঈমানী শক্তি ও তাওহীদে বলীয়ান হয়ে যুলুম ও নির্যাতন সহ্য করতে পারবে।

এই কারণে, রাসুল ﷺ প্রথমে তাঁর নিকটতম আত্মীয়দের দাওয়াত দেন। তাঁদের মধ্যে প্রথমে ইসলাম গ্রহণকারী ছিলেন খাদিজা রাঃ (প্রথম নারী), যায়েদ ইবন হারিসা (প্রথম দাস), আলী ইবন আবু তালিব (প্রথম শিশু), এবং আবু বকর সিদ্দিক রাঃ (প্রথম পুরুষ)। এদের মধ্যে আবু বকর সিদ্দিক রাঃ ছিলেন সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তি, যিনি সবকিছু আল্লাহর পথে উৎসর্গ করেন এবং ইসলাম গ্রহণের পর অনেক গরিব ও মুসাফিরকে সাহায্য করেছেন। এ কারণেই তাঁকে "সিদ্দিক" (বিশ্বাসী) বলা হয়।

এ সময় সালাত ফরজ হয় এবং প্রথমে রাসুল ﷺ এর ওপর দু'রাকাত সালাত ফরজ করা হয়, পরে মুকিম অবস্থায় চার রাকাত (মাগরিবের তিন রাকাত) ও মুসাফির অবস্থায় দুই রাকাত বহাল রাখা হয়।

## ২) দারুল আরকাম

একটি ছোট দল গঠিত হওয়ার পর, মুসলিমরা গোপনে ইসলামের শিক্ষা নিতে এবং একত্রিত হওয়ার জন্য দারুল আরকাম এ আসতেন। দারুল আরকাম ছিল মক্কার সাফা পাহাড়ের কাছে আরকাম রাঃ এর গৃহ, যেখানে সাহাবীরা একত্রিত হয়ে সালাত আদায় করতেন এবং রাসুল ﷺ এর কাছে আল্লাহর কালাম শোনার মাধ্যমে ইসলামের শিক্ষা গ্রহণ করতেন। এই সময় নাযিলকৃত আয়াতগুলোর মধ্যে তাওহীদ, চরিত্র গঠন, আত্মশুদ্ধি, জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনা এবং যুলুম ও নির্যাতনের প্রতি ধৈর্য ধারণ করার শিক্ষা দেওয়া হত।

## ৩) প্রকাশ্যে দাওয়াত

দারুল আরকামের পর, মুসলিমদের একটি শক্তিশালী দল তৈরি হলে, আল্লাহ তাআলা রাসুল ﷺ কে প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার নির্দেশ দেন। সূরা আশ-শুআরা তে আল্লাহ বলেন, **"আপনি নিকটতম আত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দিন।"** এর পর, রাসুল ﷺ আস-সাফা পাহাড়ে উঠে মক্কার জনগণকে সতর্ক করে দেন। তিনি বলেছিলেন, "যদি আমি বলি, এই পাহাড়ের পেছনে এক সৈন্যবাহিনী তোমাদের উপর হামলা করতে আসছে, তোমরা কি তা বিশ্বাস করবে?" মক্কার জনগণ উত্তর দেয়, "আমরা কখনো আপনাকে মিথ্যা বলতে শুনিনি।" তখন রাসুল ﷺ বলেন, "আমি এসেছি তোমাদেরকে এক কঠিন শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করতে।"

রাসুলুল্লাহ ﷺ সবাইকে ডাকলেন এবং তারা ভাবলো নিশ্চয়ই খুব জরুরি এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে ডাকা হচ্ছে। কিন্তু সেটা তারা অনুধাবন করতে পারলো না।
এই সময় তাঁর চাচা আবু লাহাব রেগে গিয়ে বলেন, "তোমার সারা দিন মাটি হোক, তুমি আমাদের জন্য এসব বলার জন্য এসেছ?" এর পর সূরা লাহাব নাজিল হয়, যেখানে আল্লাহ বলেন, "ধ্বংস হোক আবু লাহাবের উভয় হাত, আর সে নিজেও ধ্বংস হোক!" (সূরা লাহাব ১১১: ১-২)

এ সময় থেকে রাসুল ﷺ প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দিতে শুরু করেন, প্রথমে তাঁর নিকট আত্মীয়দের কাছে, কারণ মক্কায় গোত্রপ্রীতি গভীরভাবে প্রবিষ্ট ছিল এবং এটি ছিল ইসলামের প্রথম দাওয়াতের ক্ষেত্র।

## ৪) প্রকাশ্যে দাওয়াতের পরিণতি

রাসুল ﷺ প্রকাশ্যে দাওয়াত দেয়ার পর, তিনি কটুক্তি, অপবাদ, বিদ্রুপ এবং নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হন। তবে তিনি ধৈর্য ধারণ করে এবং আল্লাহর সাহায্যে দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যান। এ সময় আল্লাহ তাআলা রাসুল ﷺ কে আদেশ দেন,

"*আপনি প্রকাশ্যে শুনিয়ে দিন, যা আপনাকে আদেশ করা হয়েছে এবং মুশরিকদের উপেক্ষা করুন।" (সূরা হিজর ১৫:৯৪-৯৭)*

এই প্রকাশ্যে দাওয়াতের ফলে ইসলামের প্রতি বিদ্বেষী এবং শিরকবাদীদের ক্ষিপ্ততা আরও বাড়ে, তবে রাসুল ﷺ সবকিছু সহ্য করে এবং ইসলামের বাণী প্রচার অব্যাহত রাখেন।

## মক্কাবাসীর বিরোধিতা, শত্রুতা এবং নবীজির দৃঢ়তা

নবীজি সাঃ এভাবেই মানুষকে ইসলামের প্রতি আহ্বান এবং দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করছিলেন। তবে আরবরা যখন এটা জানতে পারে যে, নবীজির ﷺ ওপর যে ওহি নাজিল হয়, তাতে তাদের মূর্তিসমূহের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরা হয় এবং যারা এসব মূর্তির পূজা করছে, তাদের মূর্খতা প্রকাশ করে দেওয়া হয়েছে, তখন তারা তাঁর বিরুদ্ধে শত্রুতায় লেগে যায়। তাদের একটি দল তখন নবীজির চাচা আবু তালিবের কাছে এসে বলে, তিনি যেন তাঁকে এ ধরনের কথাবার্তা বলা থেকে বিরত রাখেন; অথবা তাঁর সাহায্য- সহযোগিতা করা থেকে তিনি

হাত গুটিয়ে নেন। আবু তালিব তখন অত্যন্ত সুন্দর ভাষায় কৌশলী জবাব দিয়ে তাদের বিদায় দেন। এদিকে নবীজি ﷺ পূর্ণ উদ্যমে দাওয়াতি কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন এবং মানুষকে মূর্তিপূজা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে যান। আরবরা যখন দেখে এভাবে কাজ হচ্ছে না, তখন আবারও তার কাছে গিয়ে শক্ত ভাষায় বলে, 'হয় আপনি আপনার ভাতিজাকে এসব কাজ থেকে বিরত রাখুন, নাহয় আমরা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামব, যে পর্যন্ত-না দু-দলের একদল ধ্বংস হয়ে যায়।

এবার আবু তালিব বেশ চিন্তায় পড়ে যান। তিনি নবীজিকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। নবিজি তখন তাঁকে বলেন, 'চাচা, আল্লাহর কসম, আরবের মূর্তিপূজারিরা যদি আমার ডান হাতে সূর্য আর বাম হাতে চাঁদও এনে দেয় এবং এটা কামনা করে যে, আমি আল্লাহর বাণী তাঁর সৃষ্টির কাছে পৌঁছাব না, তবু আমি আল্লাহর বাণী প্রচার থেকে নিবৃত হব না; যতক্ষণ-না আল্লাহর দীন মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে অথবা এ কাজে আমি আমার প্রাণ বিসর্জন দেবো।'

আবু তালিব নবীজির ﷺ দৃঢ়তাপূর্ণ এ জবাব শুনে বলেন, 'আচ্ছা ঠিকাছে, তুমি নিজের কাজ চালিয়ে যাও, আমি কখনো তোমার সাহায্য-সহযোগিতা থেকে হাত গুটিয়ে নেব না।'

## হজযাত্রীদের বাধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত:

কুরাইশরা যখন দেখল যে, বনু হাশিম ও বনু আবদুল মুত্তালিব নবীজির সঙ্গে রয়েছে এবং হজের মৌসুমও একেবারে নিকটবর্তী, তখন তারা ভাবনায় পড়ে যায়। তারা ভাবল, মুহাম্মাদ হজের মৌসুমকে সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করবেন এবং মানুষের মধ্যে তাঁর ধর্মপ্রচারের সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাবেন। তা ছাড়া তারা এটাও জানত যে, নবীজির ﷺ সত্যকথায় আকর্ষণ রয়েছে, ফলে মানুষ খুব সহজেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাবে এবং মুহাম্মাদের দীন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। সুতরাং তারা তখন সবাই একত্রিত হয়ে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেন যে, মক্কার সব রাস্তায় নিজেদের লোক বসিয়ে রাখতে হবে। এর মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হজ করতে আসা লোকদের এটা জানিয়ে সতর্ক করা হবে যে, 'এখানে একজন জাদুকর রয়েছে, সে তাঁর কথার মাধ্যমে পিতা- পুত্র, স্বামী-স্ত্রী এবং আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বিভেদ-বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে। তোমরা কেউ তাঁর ধারেকাছেও যাবে না।'

আল্লাহর কী অপার মহিমা, তাদের এ কর্মপদ্ধতি নবীজির দাওয়াতের কাজ করে দেয়। যদি তারা এমনটা না করত, তাহলে সম্ভবত এমনও হতে পারত যে, লোকজন তাঁর সম্পর্কে কিছুই জানত না। কিন্তু তাদের এই কর্মপন্থা হজ করতে আসা লোকদের কৌতূহলী করে তোলে তাঁর চিন্তা ও কথাবার্তা শোনার জন্য। তারা রাসুলের কাছে আসতো। রাসুল ﷺ তাঁর বাগ্মীতা, সঠিক

নিয়ত, বিশুদ্ধ উপমা এবং আল্লাহ প্রদত্ত ওহীর জ্ঞান দ্বারা তাদের সামনে ইসলাম পেশ করতেন। ফলে শত্রুদের পরিকল্পনা তেমন লাভ হলো না। মক্কার নেতৃত্বস্থানীয় অনেক লোক তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করল।

## উতবা ইবনে রাবিয়ার সাথে আলোচনা:

কুরাইশরা যখন দেখল, তাদের কোনো প্রচেষ্টাই কাজে আসছে না, তখন তারা পরামর্শ করে এ সিদ্ধান্ত নেয়, তারা তাদের সবচেয়ে বিচক্ষণ নেতা উতবা ইবনু রাবিআকে নবীজির ﷺ কাছে পাঠাবে। সে তাঁকে পার্থিব সব ধরনের লোভনীয় প্রস্তাব দেবে। এর ফলে হয়তো তিনি তাঁর নতুন এ ধর্মপ্রচারের কাজ থেকে বিরত থাকবেন।

উতবা ইবনু রাবিআ যখন নবীজির ﷺ কাছে যায়, নবীজি ﷺ তখন মসজিদে নামাজ পড়ছিলেন। সে তাঁকে বলে, 'ভাতিজা, তুমি বংশমর্যাদায় আমাদের সবার চেয়ে সম্ভ্রান্ত; কিন্তু এরপরও তুমি নিজেদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করছ, তাদের দেবদেবী ও তাদের সম্পর্কে তুমি নানান বাজে কথা বলছ, তোমার পূর্বপুরুষদের মূর্খ ও বোকা বলছ। আজ তুমি সত্য করেই বলো তো, এসব কর্মকান্ড দ্বারা তোমার কী উদ্দেশ্য? এর মাধ্যমে তোমার যদি উদ্দেশ্য হয়, তুমি অনেক ধনসম্পদ সঞ্চয় করবে তাহলে শুনো, আমরা তোমার জন্য এ পরিমাণ সম্পদ জোগাড় করে দেবো যে, তুমি পুরো আরবের মধ্যে সবচেয়ে বিত্তশালী হয়ে যাবে। আর যদি তোমার উদ্দেশ্য হয় তুমি নেতা হবে, তাহলে আমরা সবাই একবাক্যে তোমাকে নেতা মেনে নিতে প্রস্তুত। আমরা তোমাকে কুরাইশের সব গোত্রের নেতা বানিয়ে দেবো এবং তোমার আদেশ ছাড়া একটি কথাও এদিক-সেদিক হবে না। যদি তোমার উদ্দেশ্য এটা হয়ে থাকে যে, তুমি আমাদের বাদশাহ হবে, তাহলে এটাও আমরা মেনে নিতে রাজি আছি। আমরা সম্মিলিতভাবে তোমাকে আমাদের বাদশাহ ঘোষণা করব। যদি (নাউজুবিল্লাহ) তোমার ওপর কোনো দুষ্ট জিনের আসর থাকে; আর ওই দুষ্ট জিনের কথবার্তা (ওহি) মানুষকে শুনিয়ে থাকো তাহলে আমরা তোমাকে চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করবো।' এভাবে সে আরও নানা কথা রাসূল (সাঃ) কে বলেন। রাসূল নিবিষ্টচিত্তে তার কথা শুনছিলেন। তার কথা শেষ হলে রাসূল (সাঃ) বললেন, "হে আবুল ওয়ালীদ! আপনার কথা কি শেষ হয়েছে?" সে বলল, "হ্যাঁ!"

তখন রাসূল বললেন, "তাহলে আমার বক্তব্য শুনুন।" এই বলেই তিনি বিসমিল্লাহ পড়ে সূরা হা-মীম সিজদার ১ থেকে ১৩ নং আয়াত তেলাওয়াত করলেন।

উতবা পিঠের পেছনে হাত রেখে হেলান দিয়ে শেষ পর্যন্ত শুনলেন। তারপর রাসূল সাঃ বললেন, "হে আবুল ওয়ালিদ! শুনলেন তো। এখন আপনি বিবেচনা করুন।" উতবা সেখান থেকে উঠে

কুরাইশ নেতাদের কাছে ফিরে গেলেন। তখন তারা বলতে লাগল, "আল্লাহর কসম! আবুল ওয়ালিদ যে চেহারা নিয়ে গিয়েছিল, এখন তা থেকে ভিন্ন চেহারা নিয়ে এসেছে।" তাদের কাছে বসলে তারা বলল, "হে আবুল ওয়ালিদ! সেখানকার খবর কি?" উতবা বলল, "সেখানকার খবর এই যে, আল্লাহর কসম! আমি এমন কথা শুনেছি যা ইতিপূর্বে আর কখনো শুনিনি। আল্লাহর কসম, তার থেকে যে কথা আমি শুনেছি, তা একদিন বিপুল খ্যাতি অর্জন করবে। আর যদি কেউ তার ক্ষতি সাধন করে তাহলে তোমরা মনে করবে যে, তারা তোমাদের কাজ সম্পন্ন করে দিয়েছে। আর যদি সে বিজয়ী হয় তবে তার প্রভাব প্রতিপত্তি ও সম্মান তোমাদেরই হবে। তেমন হলে তোমরা সবচেয়ে সুখী ও সৌভাগ্যশালী জাতিতে পরিণত হবে।"
একথা শুনে সবাই বলল, "আল্লাহর কসম! সে তোমাকে নিজের কথা দিয়ে জাদু করেছে মনে হচ্ছে।"

## কুরাইশদের প্রতিক্রিয়া

## তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও উপহাস করা:

কুরাইশরা ইসলামের দাওয়াত এবং নবীজি ﷺ-কে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও উপহাস করত বিভিন্ন উপায়ে। তারা নবীজি ﷺ-কে মিথ্যাবাদী, পাগল এবং যাদুকর বলে অভিহিত করত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা সুরা আল-ফুরক্বানে বলেন,

*"তারা যখন আপনাকে দেখে, তখন কেবল বিদ্রুপের পাত্ররূপে গ্রহণ করে,বলে এ-ই কি সে যাকে আল্লাহ 'রাসুল' করে প্রেরণ করেছেন?" (সূরা ফুরক্বন,২৫:৪১)*

তারা বলতো-আল্লাহর কাছে কি রাসুল হিসেবে প্রেরণ করার জন্য এর চেয়ে যোগ্য কেউ ছিল না? তারা আল্লাহর রাসুলকে ﷺ নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা, তুচ্ছতাচ্ছিল্য, ব্যঙ্গ করা, ছোট করা কোনো কিছুই বাদ দেয় নি। রাসুলুল্লাহ সাঃ ছিলেন কুরাইশের সবচেয়ে অভিজাত পরিবারের সন্তান, সুঠাম দেহ, উন্নত চরিত্রের অধিকারী। তাঁকে দেখলেই স্বাভাবিকভাবেই তাঁর প্রতি সম্ভ্রম তৈরি হয়। তারপরও তাঁকে নিয়ে কুরাইশরা মজা উড়াতো, কারণ তিনি ধনী ছিলেন না, ক্ষমতাও ছিল না।

## মানসিক নির্যাতন:

কুরাইশের লোকেরা রাসুলুল্লাহ-কে বিভিন্নভাবে মানসিক নির্যাতন করার চেষ্টা করেছিল। একদিন কাবার পাশে কুরাইশের কিছু নেতা বসে ছিল। আবু জাহেল তাদের কাছে এসে বললো, "আজকাল তোমরা নাকি মুহাম্মাদকে মাটির সাথে মুখ ঘষাঘষি করার সুযোগ দিচ্ছ? আমি যদি তাঁকে সালাত আদায় করতে দেখি, তাহলে তাঁর গলায় পাড়া দিয়ে মুখটা ধুলোর মধ্যে ঘষে দিব।"

অন্যদিকে, যখন রাসুলুল্লাহ সালাত পড়তে এলেন, তখন আবু জাহেল এগিয়ে গেলেন। মুহাম্মাদ তখন সিজদায় ছিলেন। কিন্তু উপস্থিত সবাই দেখলো, আবু জাহেল হঠাৎ এক পা এক পা করে পেছনে পিছলে পড়লো। লোকেরা তাকে জিজ্ঞাসা করল, "তোমার হঠাৎ কি হলো?" আবু জাহেল বলল, "আমার সামনে একটা গর্ত ছিল, আর ছিল আগুন, বাতাস এবং আতংক।" রাসুলুল্লাহ বললেন, "সেগুলো ছিল ফেরেশতা। যদি সে আমার দিকে আর একটু এগিয়ে আসতো, তাহলে তারা তাকে ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলতো।"
অন্য এক ঘটনায়, উকবা ইবন আবু মুআইত একদিন রাসুলুল্লাহ-কে কাবার পাশে দেখতে পেয়ে তাঁর কাপড়ে হেচকা টান মেরে সেটা তাঁর গলায় পেঁচানো শুরু করলো। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এসে উকবাকে সরিয়ে দিলেন এবং বললেন, "তোমরা কি একজন মানুষকে শুধু এই কারণে হত্যা করবে যে সে বলে, 'আমার রব হলেন আল্লাহ'?"

এছাড়া, একদিন কুরাইশের নেতারা আবু জাহেলের নেতৃত্বে উটের নাড়িভুঁড়ি এনে রাসুলুল্লাহ -এর পিঠে ফেলে দেয়। ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহু এসে তা সরিয়ে দিলেন। রাসুলুল্লাহ তখন কিছু বললেন না, কিন্তু তাঁর হৃদয়ে কুরাইশ নেতাদের জন্য এক দুআ করেছিলেন, "হে আল্লাহ, শাস্তি দাও আবু জাহেল, উতবা ইবন রাবিয়া, শায়বা ইবন রাবিয়া, আল-ওয়ালিদ ইবন উতবা, উমাইয়া ইবন খালাফ, আর উকবা ইবন আবি মুআইতকে।" আল্লাহ তাঁর দুআ কবুল করে বদরের যুদ্ধে তাদের সবাইকে হত্যা করেন।

## ইসলামকে বিকৃত করে উপস্থাপন:

আন নযর ইবন হারিস পারস্য গিয়ে গল্প শিখে আসতো। সেখান থেকে মক্কায় ফিরে এসে সে লোকদের ডেকে ডেকে বলতো, 'আমার কাছে আসো, আমার কাছে আসলে আরও ভালো ভালো কাহিনি শুনতে পাবে।' সে লোকজনকে বলতো, মুহাম্মাদের বার্তা আসলে কেচ্ছা-কাহিনি দিয়ে ভরা, ওসব হচ্ছে গল্পকথা-কোনো ভিত্তি নেই। আল্লাহর নবীদের সাথে আসলেই কী

হয়েছিল তা কি কেউ জানে? মুহাম্মদ যা বলছে সেসব বানোয়াট রূপকথার গল্প। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

"আর তারা বলে, এগুলো তো পুরাকালের রূপকথা এসব সে লিখিয়ে নিয়েছে, আর এগুলো তার কাছে পাঠ করা হয় সকালে ও সন্ধ্যায়।" (সূরা ফুরক্বান, ২৫:৫)

## অত্যাচার-নিপীড়ন:

নবুওয়্যাতের প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ ﷺ অপবাদ, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অপমান, ক্ষয়-ক্ষতি সহ্য করলেও, অত্যাচার-নির্যাতন কখনো সহ্য করেননি। তবে তাঁর সাহাবীদের ওপর নানান অত্যাচার এবং নিপীড়ন চালানো হয়। আল্লাহ তাআলা নবীজির চাচা আবু তালিবের মাধ্যমে তাঁকে নিরাপত্তা দেন, কিন্তু তাঁর অনুসারী মুসলিমরা নানা অত্যাচারের শিকার হন। এসব ঘটনার ফলে নবীজির মনে গভীর দাগ পড়ে, কারণ তিনি ছিলেন তাঁর সাহাবীদের জন্য অন্তঃপ্রাণ। সাহাবীদের ওপর অত্যাচার তাঁকে প্রচণ্ড পীড়া দিত, তিনি তাদের কষ্ট সহ্য করতে পারতেন না।

একটি বর্ণনায় ইবন ইসহাক বলেন, "কুরাইশরা মুসলিমদেরকে লোহার পাতে মুড়ে কড়া রোদের নিচে রেখে দিত, যেন তাদের শরীরগুলো সূর্যের উত্তাপে ঝলসে যায়।" এর মধ্যে সবচেয়ে দৃঢ়তার পরিচয় দেন সাহাবী বিলাল। তাঁকে যতই অত্যাচার করা হতো, তিনি যেন ততোই দৃঢ় হতেন। একদিন তাঁকে প্রশ্ন করা হয়, "এত নির্যাতন সত্ত্বেও আপনি 'আল্লাহ এক' (আহাদ, আহাদ) কেন বলতেন?" বিলাল বলেন, "যতবারই আমি 'আল্লাহ এক' বলতাম, ওরা আরও ক্ষেপে যেতো, আরও বেশি অত্যাচার করতো, তাই বারবার আমি এই কথাটি বলতাম।"

উসমান ইবনে আফফান রা. যখন ইসলাম গ্রহণ করেন, তখন তাঁকে মারাত্মক নির্যাতনের শিকার হতে হয়। কুরাইশরা তাঁকে কার্পেটে মুড়ে তার গায়ের ওপর লাফাতো এবং পায়ের চাপায় পিষে দিতো।

আবু জাহেল ছিল ইসলামবিরোধী কঠোর নেতা। সে তাঁর অধীনস্ত দাসী সুমাইয়া রা., তার স্বামী ইয়াসির, এবং ছেলে আম্মারের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালান। ইয়াসির এবং সুমাইয়া দুজনেই আবু জাহেলের হাতে শহীদ হন। আম্মার রা. যখন বাবা-মায়ের নির্মম নির্যাতনের দৃশ্য দেখলেন, তখন তিনি শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতনে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। এক সময়, তাঁর মুখ থেকে কিছু কথা বেরিয়ে যায় যা নবীজির বিরুদ্ধে ছিল। কিন্তু পরে তিনি নবীজির ﷺ কাছে এসে পুরো ঘটনা খুলে বললেন। এই ঘটনার পর, আল্লাহ তাআলা কুরআনে এক আয়াত নাযিল করেন:

"যদি কোনো মুসলিম অত্যাচারের কারণে ঈমানের বিপরীতে কিছু বলে, তবে তাকে মাফ করা হবে, যদি তার অন্তরে ঈমান অটুট থাকে।" (সূরা নাহল, ১৬: ১০৬)

উমার ইবন খাত্তাব রা. ইসলাম গ্রহণের আগে ইসলামবিদ্বেষী ছিলেন। তাঁর একজন দাসী ছিল, যাকে তিনি বহু মারধর করতেন এবং মাঝে মাঝে বলতেন, "মনে কোরো না যে, তোমার ওপর দয়া দেখিয়ে আমি তোমাকে পেটানো বন্ধ করেছি। আমি শুধু ক্লান্ত, তা না হলে আরও মারধর করতাম।"

## হত্যার পরিকল্পনা:

পৃথিবীর বুক থেকে ইসলামের নাম চিরতরে মুছে দেওয়ার জন্য কুরাইশরা প্রথমে রাসূলুল্লাহর ﷺ ভাবমূর্তি নষ্ট করতে চেয়েছিল। বলেছিল-এই লোকটা উন্মাদ, জাদুকর, এর কথার কোনো দাম নেই। কিন্তু বার বার ব্যর্থ হয়ে তারা শেষ পর্যন্ত নবীজিকে জানে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয়। আবু তালিব বেঁচে থাকতে তাদের সাহস এতোটা বাড়ে নি। তারা জানতো যে, নবীজিকে হত্যা করলে আবু তালিবের হাত থেকে তাদের মুক্তি নেই। কিন্তু আবু তালিব মারা যাওয়ার পর এসব ষড়যন্ত্র করতে আর কোনো বাধা থাকলো না। তারা নবীজিকে হত্যা করার পরিকল্পনা আঁটে। একের পর এক চাল চালে, কিন্তু প্রতিবারই আল্লাহ আযযা ওয়াজাল তাঁকে সুরক্ষিত রাখেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন:

*"কাফিররা যখন আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল যে আপনাকে বন্দী করবে অথবা হত্যা করবে অথবা বের করে দেবে তখন তারা যেমন আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল, আল্লাহও তেমনি পরিকল্পনা করেছিলেন। আর পরিকল্পনাকারীদের মধ্যে আল্লাহই শ্রেষ্ঠ।" (সূরা আনফাল, ৮: ৩০)*

# হিজরত

## প্রথম হিজরত আবিসিনিয়ায়:

এতদিন কুরাইশ কাফিররা শুধু নবীজিকে অত্যাচার-নির্যাতন করে আসছিল, যা তিনি নীরবে সহ্য করে যাচ্ছিলেন। এবার সাহাবায়ে কিরাম এবং অন্যান্য আত্নীয়স্বজনের প্রতিও নির্যাতনের ধারা শুরু হয়। নবুওয়াতের ৫ম বর্ষে গিয়ে তা একেবারে চরম আকার ধারণ করে এবং সাহাবীগণের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। এভাবে একটা পর্যায়ে যখন দ্বীন ইসলাম ও ঈমানের উপর কায়েম থাকা জীবনের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠল তখন আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন-

*বলুন, হে আমার বিশ্বাসী বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। যারা এ দুনিয়াতে সৎকাজ করে, তাদের জন্যে রয়েছে পুণ্য। আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত। যারা সবরকারী, তারাই তাদের পুরস্কার পায় অগণিত। (সূরা যুমার, ৩৯:১০)*

এই আয়াত নাযিল করার মাধ্যমে আল্লাহ মুসলিমদেরকে নিরাপদ ভূমিতে পাড়ি জমানোর অনুমতি দিলেন। এই সময় রাসূল সাঃ সাহাবীদেরকে বললেন, "তোমরা আল্লাহর যমীনের কোথাও হিজরত করে চলে যাও। শীঘ্রই আল্লাহ তোমাদেরকে একত্রিত করবেন"। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, "আমরা কোথায় যাব?" রাসূল সাঃ তখন আবিসিনিয়ার দিকে ইঙ্গিত করলেন এবং বললেন, "সেখানে এক ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ আছে যার সাম্রাজ্যে কেউ কারও উপর যুলুম করতে পারে না"।

অবশেষে নবুওয়াতের ৫ম বর্ষের রজব মাসে ১৬ জন সাহাবীর একটি দল আবিসিনিয়ার পথে পাড়ি জমান। এই দলে ছিলেন ১১ জন পুরুষ এবং ৫ জন নারী।

প্রথম দলটি আল-হাবাশা অর্থাৎ আবিসিনিয়াতে পৌঁছে গুজব শুনতে পায় যে, মক্কার কুরাইশরা মুসলিম হয়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা ছিল ভিন্ন। রাসূলুল্লাহ সূরা আন-নাজমের আয়াতগুলো কুরাইশদের লোকদের পড়ে শোনালে সেই আয়াতগুলো তাদেরকে ব্যাপকভাবে নাড়া দেয়। তিনি শেষ আয়াতে পৌঁছানো মাত্রই সবাই সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। এই শেষের আয়াতটি ছিল সিজদাহ'র আয়াত। সে সময় নবীজি আর মুসলিমদের সাথে সাথে কাফেররাও সিজদা দেয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, কুরাইশের লোকেরা মুসলিম হয়ে গেছে। ফলে হাবাশা থেকে মুসলিমরা মক্কায় ফিরে আসেন। এসে বুঝতে পারেন যে, এ খবর মিথ্যা।

সাহাবীদের কষ্ট আর যন্ত্রণা দেখে রাসূলুল্লাহ সাঃ তাদেরকে বললেন, 'তোমরা হাবাশাতে চলে গেলেই পারো, কেননা সেখানে একজন ন্যায়পরায়ণ রাজা আছেন। তিনি কারো সাথে জুলুম করেন না।' এই রাজা হলেন আন-নাজ্জাশী, খ্রিস্টান ধর্মের অনুসারী। নবীজির পরামর্শ অনুযায়ী সাহাবারা দ্বিতীয়বারের মতো হাবাশায় হিজরত করেন। এ দফায় তাদের সংখ্যা ছিল ৮৩ জন পুরুষ এবং ১২ জন নারী। সবার আগে উসমান ইবন আফফান, তাঁর স্ত্রী নবীকন্যা উম্ম কুলসুমকে নিয়ে মক্কা ত্যাগ করেন। তাঁরা চলে গেলে দ্বিতীয় দলটিও মক্কা ত্যাগ করে।

## হিজরতকারীদের জোরপূর্বক ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা :

আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী মুসলিমরা রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক দিক থেকে মক্কার জন্য হুমকিস্বরূপ ছিল না। তবুও কুরাইশরা মুসলিমদের ফেরত পাঠানোর জন্য বাদশা নাজ্জাশীর কাছে দূত পাঠালো। এই মিশনের জন্য তারা মনোনীত করে আমর ইবনে আস এবং আবদুল্লাহ ইবনে রাবিআকে। আমর ইবনে আস ছিলেন একজন দক্ষ কূটনীতিবিদ।

আমর ইবনে আস নাজ্জাশীর দরবারে যান। তার পরিকল্পনা ছিল প্রথমে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের কিছু উপহার সামগ্রী দিয়ে তাদের সমর্থন সংগ্রহ করা, যাতে নাজ্জাশীকে মুসলিমদের বিষয়ে প্রভাবিত করা সহজ হয়। আমর ঠিক এই কাজটাই করলেন।
এরপর আমর নাজ্জাশীর কাছে পৌঁছান। বললেন, 'আমাদের মধ্যে কিছু লোক আছেন যারা গণ্ডমূর্খ। তারা আপনার দেশে আশ্রয় নিয়েছে। তারা আমাদের ধর্ম ত্যাগ করলেও, আপনার ধর্ম গ্রহণ করেনি', এভাবে তিনি উত্তেজক কথা বলে নাজ্জাশীকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন। তারপর বললেন, 'আমার অনুরোধ, আপনি তাদের আমাদের হাতে ফিরিয়ে দিন।' এ সময় নাজ্জাশীর কিছু কর্মকর্তাও আমর ইবনে আসের পক্ষে সায় দিয়েছিল।

তবে নাজ্জাশী বললেন, 'না, যারা আমার দেশে আশ্রয় নিয়েছে, আমি তাদেরকে অন্য কারো হাতে তুলে দেবো না।'
এসময় নাজ্জাশী মুসলিমদের ডেকে পাঠালেন। তাদের বলা হলো, 'মক্কার আমর ইবনে আস নাজ্জাশীর সাথে সাক্ষাৎ করেছে এবং এখন নাজ্জাশী আপনাদের সাথে কথা বলতে চান।' মুসলিমরা একত্রিত হয়ে পরামর্শ করলেন এবং সিদ্ধান্ত নিলেন যে, জাফর ইবনে আবি তালিব মুসলিমদের মুখপাত্র হবেন এবং তিনি সত্য কথা বলবেন। মুসলিমরা নাজ্জাশীর দরবারে উপস্থিত হলে, নাজ্জাশী তাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কোন ধর্মে বিশ্বাসী? তোমরা তোমাদের দেশের ধর্ম ত্যাগ করেছো, আবার আমাদের ধর্মও গ্রহণ করোনি। তোমরা কারা?'

উত্তরে জাফর রা.বলেন, 'হে রাজা, আমরা আগে ছিলাম মুশরিক। আমরা মূর্তি পূজা করতাম, মৃত পশুর মাংস খেতাম, একে অপরের রক্ত খুন করতাম, অবৈধ কাজকে বৈধ করে নিতাম। আমরা জানতাম না ভালো কাজ কী এবং মন্দ কাজ কী। আমাদের মধ্যে কোন নীতি ছিল না। এরপর আল্লাহ আমাদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছেন, যিনি সব সময় সত্য বলতেন, ছিলেন বিশ্বস্ত। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে শুধুমাত্র তাঁর ইবাদত করতে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করতে আদেশ দিয়েছেন। তিনি আমাদের আত্মীয়তার হক পূরণ করতে, অতিথিদের সম্মান জানাতে, এবং হারাম কাজ থেকে বিরত থাকতে শিখিয়েছেন।

এছাড়া, জাফর রা. মুসলিমদের উপর কুরাইশদের অত্যাচারের বিষয়টিও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "আমরা ঈমান গ্রহণ করার পর আমাদের উপর অত্যাচার করা হয়েছে, আমাদের ধর্ম থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করা হয়েছে। তারা আমাদেরকে মূর্তিপূজায় ফিরিয়ে নিতে চেয়েছিল, এবং যখন তারা আমাদের ওপর জুলুম করতে শুরু করল, আমরা নিজেদের ধর্ম পালন করার জন্য এ দেশ ত্যাগ করে আপনার আশ্রয়ে এসেছি।"

এই কথাগুলোর পরে, নাজ্জাশী অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন, কারণ তিনি ঈসা (আঃ) ও তাঁর অনুসারীদের উপর অন্যায় অত্যাচারের কথা স্মরণ করেছিলেন। তিনি জাফরের উত্তরে বলেন, "মুহাম্মদ ﷺ যা কিছু এনেছেন, সে সম্পর্কে তোমাদের কি কিছু আছে?" তখন জাফর রা. সূরা মারইয়াম থেকে কুরআনের আয়াতগুলি তিলাওয়াত করেন, যা নাজ্জাশী ও তার সভাসদদের হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলে এবং তারা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে।

এই ঘটনার পর, নাজ্জাশী মুসলিমদের জন্য সুরক্ষা ঘোষণা দেন এবং কুরাইশদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি ঘোষণা করেন, "তোমরা যা বলছো, তা সত্য। আমি এই মানুষগুলোকে আমার রাজ্যে স্বাধীন ঘোষণা করলাম।" এইভাবে, বাদশা নাজ্জাশী ইসলামের প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন এবং মুসলিমদের আশ্রয় প্রদান করেন, যা ইসলামের ইতিহাসে একটি চিরকাল স্মরণীয় ঘটনা হয়ে থাকে।

## আবিসিনিয়ায় হিজরতের কারণ:

মুসলমানদের ওপর কুরাইশদের নির্যাতনের ফলে রাসুলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের মক্কার বাইরে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য নির্দেশ দেন। আবিসিনিয়া বেছে নেওয়ার কারণগুলো ছিল:

১) রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আবিসিনিয়ায় যাও, সেখানে এমন এক রাজা আছেন যিনি কাউকে অত্যাচার করেন না।" তাই সাহাবিরা জানতেন, সেখানে ন্যায়বিচার পাবেন।

২) আবিসিনিয়ার সঙ্গে আরবদের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। কুরাইশরা সেখানে নিয়মিত ব্যবসা করত। ফলে আবিসিনিয়া সম্পর্কে তারা পরিচিত ছিল।

৩) রাসুলুল্লাহ ﷺ আবিসিনিয়ার সংস্কৃতি সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তাঁর প্রথম ধাত্রী হযরত উম্মে আইমান ছিলেন আবিসিনিয়ার অধিবাসী।

৪) মক্কা থেকে জেদ্দা পৌঁছাতে ১.৫ দিন এবং সেখান থেকে আবিসিনিয়া সমুদ্রপথে যেতে মাত্র ৫-৭ ঘণ্টা সময় লাগত। তাই এই স্থানটি ভ্রমণের জন্য সহজ এবং দ্রুতগম্য ছিল।

৫) আবিসিনিয়ার জনগণ ছিল খ্রিস্টান, যারা কুরাইশদের মতো মুশরিক ছিল না। আহলে কিতাব হওয়ায় তারা মুসলমানদের সাথে কিছুটা নিকটবর্তী ছিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

*"খ্রিস্টানরা মুসলমানদের প্রতি অধিক বন্ধুত্বপূর্ণ, কারণ তাদের মধ্যে আলেম ও দরবেশ আছেন এবং তারা অহংকার করেন না।" (সূরা মায়িদা, ৫:৮২)*

৬) আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশী গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সাহাবিদের সাহায্য করেন। তিনি জাফর ইবন আবি তালিব থেকে ইসলাম শিক্ষা নিতেন। তাঁর মৃত্যুতে রাসুলুল্লাহ ﷺ মদিনায় জানাজার সালাত পড়েন।

এসব কারণেই সাহাবিরা আবিসিনিয়ায় হিজরত করে সেখানে শান্তি ও নিরাপত্তা খুঁজে পান।

# হামজা রা. ও উমর রা.এর ইসলাম গ্রহণ

## হামজা রা. এর ইসলাম গ্রহণ:

হামজা রাঃ ইসলাম গ্রহণ করে নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ বর্ষের শেষভাগে, খুব সম্ভবত যুল হিজ্জাহ মাসে। একদিন রাসূল (সাঃ) পাহাড়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ঘটনাক্রমে আবু জাহেল সেখানে এসে পড়ল। সে রাসূল (সাঃ) কে অনেকগুলো কথা বলল এবং আজেবাজে গালিগালাজ করলো। কিন্তু তিনি কোন জবাব দিলেন না। এই সমস্ত ঘটনা আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের দাসী দেখছিল। হামজা তীর-ধনুক নিয়ে ফিরে আসলে তিনি সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। এ কথা শুনে হামজার আত্মসম্মানবোধে আঘাত লাগলো। তিনি আবু জাহেল এর সন্ধানে বের হলেন। কাবা ঘরের সামনে তাকে বসে থাকতে দেখলেন। তিনি সোজা গিয়ে তার মাথায় ধনুক দিয়ে আঘাত করলেন। তখন তার মাথা গরম ছিলো। তিনি বললেন, "তুই মুহাম্মদকে গালি দিস। অথচ আমি নিজেই তার দ্বীনের অনুসারী।"

উপস্থিত কেউ কেউ আবু জাহেল এর সাহায্যে এগিয়ে আসলো। কিন্তু হামজা তাদেরকে বললেন, "তোমরা তাকে ছেড়ে দাও। আজ আমি তার ভাতিজাকে অনেক গালিগালাজ করেছি।"

মূলত আবু জাহল এই ভয়ে ছিল যে আবেগের বশেই না হামজা রাঃ ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেন, তাই সে হামজা রাঃ কে শুনিয়ে শুনিয়ে মুহাম্মাদ সাঃ এর প্রতি সহানুভূতিমূলক কথাগুলো বলছিল।

তখন উপস্থিত কেউ কেউ হামজা কে বললেন, "তুমি কি তোমার ধর্ম থেকে বেরিয়ে গেছো?"

হামজা বললেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি মহান আল্লাহ এক। তার রাসূল (সাঃ) তিনি যা বলেন তা যথাযথ। আমি কখনো তা থেকে বিরত হব না। তোমারা যা খুশি করতে পারো। মুহাম্মদ রাসূল হওয়ার ব্যাপারে সত্যতা ব্যাপকভাবে প্রকাশ পেয়েছে।" এ কথা বলে হামজা বাড়ি চলে গেলেন।

তিনি মূলত এই কথাগুলো মন থেকে বলেননি। বরং রাগের মাথায় আত্মসম্মানবোধ থেকে বলেছেন। কিন্তু বাড়ি ফিরে যাওয়ার পর তার অন্তরে শয়তান প্ররোচনা দিতে লাগল। এবং পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ না করার জন্য জোর দিতে লাগল। তিনি সারারাত ঘুমুতে পারলেন না। অস্থিরতায় কাতর হয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ! যদি এটা সত্য হয়, তবে তার সত্যতা আমার অন্তরে ঢেলে দাও। আর যদি ভুল হয়, তাহলে অন্য দিকে বেরিয়ে যাওয়ার কোন পথ সৃষ্টি করে দাও।"

ভোর হওয়ার পূর্বেই তার অন্তর থেকে আল্লাহ সমস্ত সন্দেহ দূর করে দিলেন। এবং ইসলামের ব্যাপারে তার অন্তরকে আশ্বস্ত করলেন। তিনি সকালবেলা রাসূল (সাঃ) এর কাছে গিয়ে সবকিছু খুলে বললেন। এবং স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে ইসলাম গ্রহণ করলেন।

## উমব ইবনু খাত্তাব রা. এর ইসলাম গ্রহণ:

উমর ইবনুল খাত্তাব রা. প্রথমে ইসলামের ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং মুসলমানদের নির্যাতনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন। এমনকি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যার পরিকল্পনাও করেছিলেন। তবে তাঁর অন্তরে সত্য গ্রহণের এক সুপ্ত ইচ্ছা ছিল, যা তাঁকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে নিয়ে আসে।

একদিন উমর রা. রাসূল ﷺ-কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে রওনা হন। পথে তিনি নু'আইম ইবন আবদুল্লাহ নামক একজন সাহাবির সাথে দেখা করেন। নু'আইম তাঁকে জানান যে তাঁর নিজের বোন ফাতিমা বিনতে খাত্তাব এবং ভগ্নিপতি সাঈদ ইবন যুবাইর ইসলাম গ্রহণ করেছেন। খবরটি শুনে উমর রা. প্রচণ্ড রেগে গিয়ে তাঁদের বাড়ি পৌঁছান। সেখানে তিনি দেখতে পান, তাঁরা কুরআন তিলাওয়াত করছেন।

বোনের বাড়িতে প্রবেশ করে উমর রা. তাঁদের সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হন এবং তাঁর বোনকে আঘাত করেন। রক্তাক্ত অবস্থায় বোন ফাতিমা বলেন, "আমরা যা মেনে নিয়েছি, তা সত্য। আপনি আমাদের যতই আঘাত করুন, আমরা তা পরিত্যাগ করব না।" বোনের এই সাহসী কথায় উমর থমকে যান। এরপর তিনি বোনের কাছে থাকা কুরআনের পাণ্ডুলিপি দেখতে চান।

তাঁর বোন বলেন, "আপনি পবিত্র না হয়ে কুরআন স্পর্শ করতে পারবেন না।" উমর রা. ওজু করেন এবং কুরআনের সূরা ত্বাহা'র কিছু আয়াত পড়েন। আয়াতের গভীর অর্থ ও সৌন্দর্য তাঁর অন্তরকে আলোড়িত করে এবং তিনি কাঁপতে কাঁপতে বলেন, "এটি কতই না চমৎকার একটি বাণী।"

এরপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যান এবং ইসলাম গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। রাসূল ﷺ তখন আরকাম ইবন আবিল আরকাম রা.-এর বাড়িতে ছিলেন। উমর রা.-এর আগমনে সাহাবিগণ শঙ্কিত হলেও রাসূল ﷺ সাহসিকতার সঙ্গে তাঁকে গ্রহণ করেন। উমর রা. সেখানে কালিমা পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করেন।

উমর রা.-এর ইসলাম গ্রহণ মক্কার মুসলমানদের জন্য এক বড় বিজয় এবং ইসলামের জন্য এক উল্লেখযোগ্য মাইলফলক ছিল। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমানরা প্রকাশ্যে ইবাদত করার সাহস অর্জন করে এবং ইসলামের দাওয়াতের গতিও বৃদ্ধি পায়।

## বয়কট

যখন কুরাইশরা আবিষ্কার করলো ঈমানদারদের মধ্যে কিছু লোক আবিসিনিয়া হিজরত করে সেখানে নিরাপদে আছে আর মক্কায় উমার ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তারা বুঝতে পারল যে ইসলাম দ্রুততার সাথে প্রসার লাভ করতে শুরু করেছে। তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, নবীকে ﷺ মেরে ফেলা ছাড়া আর কোনো সমাধান নেই। মরিয়া হয়ে রাসূলুল্লাহর ﷺ ওপর সামাজিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলো। ইতিমধ্যেই তারা আনুষ্ঠানিকভাবে বনু হাশিমকে অনুরোধ করেছিল যেন মুহাম্মাদকে তাদের হাতে হস্তান্তর করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই বনু হাশিম কুরাইশদের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। এরপর কুরাইশের বিভিন্ন গোত্র বনু হাশিম এবং বনু আল মুত্তালিব- এ দুটো গোত্রের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে তাদেরকে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বয়কট করার ব্যাপারে চুক্তিতে আবদ্ধ হলো। তবে আবু লাহাব রাসূলুল্লাহর ﷺ আপন চাচা ও একই গোত্রের একজন হওয়া সত্ত্বেও তাকে বয়কট করা হয় নি, কারণ সে নিজেও ইসলামের একজন প্রধান শত্রু।

মক্কী জীবনের সপ্তম বছরে মুহাররাম মাসে এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী বনু হাশিম ও বনু আল মুত্তালিবের সাথে সকল প্রকার ব্যবসায়িক লেনদেন নিষিদ্ধ করা হয়। চুক্তিতে ঠিক হলো- তাদের সাথে কোনো বাণিজ্য করা হবে না, তাদের কাউকে কেউ বিয়ে করবে না অথবা তাদের কাছে কেউ বিয়ে দেবে না, যতক্ষণ না তারা মুহাম্মাদকে কুরাইশ নেতৃবৃন্দের হাতে হস্তান্তর করছে।

গোত্র দুটো চারদিক থেকে ঘেরাও করে রাখা। কুরাইশরা নিশ্চিত করতে চায় যেন বনু হাশিম ও বনু আল মুত্তালিবের কাছে যেন কোনো খাবার না পৌঁছে। কুরাইশদের উদ্দেশ্য এই দুই গোত্রের উপর চাপ সৃষ্টি করে রাসূলুল্লাহকে তাদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য করা। কাবাঘরের ভিতরে বয়কট চুক্তির দলিল টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়। তবে দুই গোত্রের মাঝে সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। কঠিন সময়েও তারা একে অপরের পাশে দাঁড়াতো। পরিস্থিতি বেশ মারাত্মক আকার ধারণ করে। বনু হাশিম ও বনু আল মুত্তালিব গোত্রের নারী-পুরুষ-শিশু ক্ষুধায় কষ্ট পেতে থাকে। সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস সেই অবস্থা বর্ণনা করেন, 'আমরা এত ক্ষুধার্ত ছিলাম যে,

গাছের পাতা খেয়ে বেঁচে থাকতে হতো। বনু হাশিম ও বনু আল মুত্তালিবের অধিকাংশ লোক মুসলিম ছিল না। কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে পুরো গোত্রের উপর ছিল।

## বয়কটের অবসান:

বয়কট চুক্তির বিরোধিতায় যে লোকটি উঠে দাঁড়ান তিনি হিশাম ইবন আমর। তিনি ছিলেন বনু হাশিমের মাতৃসম্পর্কীয় আত্মীয়। চুক্তি বাতিল করার পেছনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। খাবারে বোঝাই একটি উট নিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যেতেন, বনু হাশিম গোত্রের কাছাকাছি গেলে উটটি ছেড়ে দিতেন যেন সেটা চড়তে চড়তে পাহাড়ের নিচে বনু হাশিমের কাছে গিয়ে পৌঁছে, যেন খাবারগুলো তারা পায়।

একদিন যুহাইর ইবন আবি উমাইয়ার কাছে গিয়ে বললেন, 'যুহাইর! তোমার আপন মামারা নিদারুণ যন্ত্রণায় প্রতিটি মুহূর্ত কাটাচ্ছে, আর তুমি খেয়ে-পরে-আনন্দের মধ্যে বসে আছো কীভাবে? আমি শপথ করে বলছি, যদি এই মানুষগুলো আবুল হাকামের নিজের মামা হতো, সে তাদের সাথে কখনো এরকম করতো না।' যুহাইরও বনু হাশিমের মাতৃসম্পর্কীয় আত্মীয় ছিলেন। হিশাম তাঁকে বোঝালেন যে, আবু জাহেলের অন্যায় ও দ্বিমুখী নীতি মেনে নেওয়া তাদের ঠিক হচ্ছে না। যুহাইর ইবন আবি উমাইয়া জবাব দিলেন,

- তুমি আমাকে দোষারোপ করছো? আমি একা একজন মানুষ, আমি কী করতে পারি বলো? আল্লাহর শপথ, যদি আমার পাশে আর একটি লোকও থাকতো, আমি এই নিষেধাজ্ঞার দলিল বাতিল করে আসতাম।

- বেশ, তোমার সাথে একজন আছে, হিশাম জানালেন।

- কে সে?

- আমি আছি তোমার সাথে।

- তাহলে চলো তৃতীয় একজনকে খুঁজে বের করি।

হিশাম তৃতীয় একজনকে খুঁজে বের করতে বেরিয়ে গেলেন। তিনি দেখা পেলেন মুতইম ইবন আদীর, তাকে বললেন,

- মুতইম! তুমি কি বনু আল মানাফের দুই গোত্রের কষ্ট দেখে আনন্দিত হচ্ছো? কুরাইশদের চুক্তিটি তুমি দেখনি? আল্লাহর কসম, তুমি যদি আজকে তাদেরকে এই কাজ করতে দাও, তাহলে কালকে তারা তোমার সাথেও একই কাজ করবে।

- তা বুঝলাম, কিন্তু আমি এক্ষেত্রে কী করতে পারি? আমি তো একা।

- তোমার সাথে আমিও আছি।

- তৃতীয় একজনকে খুঁজে বের করলে কেমন হয়?

- তৃতীয় জনকেও আমি পেয়েছি। সে হলো যুহাইর ইবন আবি উমাইয়া।

- বাহ! তাহলে চতুর্থ কাউকে খুঁজে বের করা যাক।

চতুর্থজনকেও এভাবে খুঁজে পাওয়া গেল, তিনি হলেন আবুল বাখতারি। তিনিও এই চুক্তির বিরোধী ছিলেন। তিনি তাদের প্রস্তাবে রাজি হলেন এবং তাদের পক্ষে আরো লোক খুঁজে বের করার কথা বললেন। এরপর হিশাম খুঁজে পেলেন পঞ্চমজনকে। তিনি হলেন জামা ইবন আসওয়াদ। তাঁরা পরিকল্পনা করে পরদিন রাতের বেলা আল হুজুমে দেখা করলেন এবং সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন পরদিন সকালে গিয়ে তাঁরা সমস্ত দলিল নষ্ট করে ফেলবেন। কিন্তু সেটা এমনভাবে করা হবে যেন কেউ বুঝতে না পারে যে ঘটনাটি পূর্বপরিকল্পিত।

পরদিন সকালে যুহাইর ইবন আবি উমাইয়া এক বিশেষ পোশাক পরে (জোব্বা) কাবাঘরে তাওয়াফ করলেন। সময়টি ছিল কুরাইশ নেতাদের সাক্ষাতের সময়। তাদের এই সমাবেশ হতো আন নাদওয়াতে। যুহাইর সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন,

'হে কুরাইশের লোকসকল! তোমাদের কি খুব আনন্দ হচ্ছে যে তোমরা ভালো খেয়ে- পরে আরাম-আয়েশে দিন কাটাচ্ছো, ওদিকে বনু হাশিম আর বনু মুত্তালিব দুর্দশার জীবন পার করছে? আল্লাহর শপথ করে বলছি, এই দলিল ছেঁড়ার আগ পর্যন্ত আমি ক্ষান্ত হবো না।'

পূর্ব পরিকল্পনা মতে, ওই পাঁচজনের দ্বিতীয় ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হ্যাঁ! আমিও কখনই ওই দলিলের সাথে একমত ছিলাম না।' এরপর তৃতীয়জন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি শপথ করে বলছি আমি এই দলিলের সাথে নেই এবং আমি এই ধরনের চুক্তির অংশ হতে চাইনা।' এরপর চতুর্থজন উঠে দাঁড়িয়ে নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে কথা বললো এবং সবশেষে হিশাম ইবন আমর উঠে দাঁড়িয়ে কথা বললেন।

তখন আবু জাহেল উঠে দাঁড়িয়ে বললো, ‘এই ঘটনা সাজানো, তোমরা রাতেই এসব পরিকল্পনা এঁটেছিলে।' কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যায়, বিষয়টি নিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল, দলিলটি ছেঁড়ার জন্য আল মুতইম ইবন আদী কাবাঘরের দিকে ছুটে যান। তিনি আবিষ্কার করলেন সেই দলিলটি ইতিমধ্যেই উইপোকা খেয়ে ফেলেছে। শুধুমাত্র "আমাদের রবের নামে"-এই বাক্যটি ছাড়া!

দুই বা তিন বছর নিষেধাজ্ঞা কার্যকর থাকার পর এভাবেই নাটকীয়তার সাথে এর পরিসমাপ্তি ঘটে।

## দুঃখের বছর

## আবু তালিবের মৃত্যু:

মাক্কী জীবনের ১০ম বছরকে বলা হয় আমুল হুযন বা দুঃখের বছর। কুরাইশ কর্তৃক আরোপিত নিষেধাজ্ঞা শেষ হওয়ার পর প্রায় ছয় মাস পরের ঘটনা, যে মানুষটি এতদিন ধরে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর পাশে ছিলেন, সেই আবু তালিব মৃত্যুশয্যায় শায়িত। আবু তালিবের মৃত্যুশয্যায় রাসূল সাঃ তাঁকে বললেন, "চাচাজান! আপনি শুধু একবার লা-ইলাহা কালিমাটি পাঠ করুন, যাতে আমি বিচারদিবসে আপনার জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে পারি"। আবু তালিবের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন কুরাইশ নেতৃবৃন্দ। তাদের মধ্যে আবু জাহল এবং আব্দুল্লাহ ইবনে আবি উমাইয়া বলল, "আবু তালিব। আপনি কি তাহলে শেষ পর্যন্ত আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম থেকে বিমুখ হয়ে যাবেন?" এরপর আবু তালিব যাতে কালিমা পড়তে না পারেন এজন্য তারা ক্রমাগত আবু তালিবের সাথে কথা বলতে থাকেন। অবশেষে আবু তালিব মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। মৃত্যুর আগে শেষ যে বাক্যটি তিনি বলেন তা ছিল- "আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মের উপর"।

রাসূল সাঃ আবু তালিবের এমন মৃত্যু দেখে বললেন- "আমি যতক্ষণ বাধাপ্রাপ্ত না হব ততক্ষণ আপনার জন্য
দূয়া করতে থাকব"। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ নাযিল করেন-

*নবী ও মুমিনের উচিত নয় মুশরিকদের মাগফেরাত কামনা করা, যদিও তারা আত্মীয় হোক; একথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে তারা দোযখী। (সূরা তাওবা, ৯:১১৩)*

সহীহ বুখারীতে বর্ণীত হয়েছে, আব্বাস রাঃ রাসূল সাঃ কে জিজ্ঞেস করলেন যে, "তুমি তোমার চাচার কী উপকারে আসবে?" উত্তরে রাসূল সাঃ বললেন, "তিনি এখন জাহান্নামের অগভীর স্থানে আছেন। যদি আমি তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত না হতাম তাহলে তিনি জাহান্নামের অতলে থাকতেন"।

## খাদিজা রাঃ এর মৃত্যু:

খাদিজা রাঃ নবুওয়াতের ১০ম বর্ষের রমযান মাসের ১০ তারিখে ইন্তিকাল করেন। রমযান মাসে তাঁর ইন্তিকালের ব্যাপারে তেমন কোন মতভেদ নেই। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর (মতান্তরে ৫৩/৫৫ বছর) এবং সেসময় রাসূল সাঃ এর বয়স ছিল ৫০ বছর।

আবু তালিব এবং খাদিজা রাঃ এর ইন্তিকালের পর কুরাইশদের অত্যাচার আগের চেয়েও বেড়ে যায়।এই সময়ই আবু বকর রাঃ অতিষ্ঠ হয়ে হিজরতের পথ ধরেন। তারা রাসূল সাঃ এর সাথে এমন আচরণ করতে থাকে যা আবু তালিবের জীবদ্দশায় সম্ভব হয়নি। একদিন রাসূল সাঃ রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় এক কুরাইশ কাফির এসে তাঁর মাথায় মাটি নিক্ষেপ করে। তিনি সেই অবস্থাতেই ঘরে ফিরে আসেন। ঘরে ফেরার পর তাঁর এক কন্যা সেই মাটি ধুইয়ে দেয় এবং পিতার অবস্থা দেখে কাঁদতে থাকে। রাসূল সাঃ তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বললেন, "মেয়ে আমার। তুমি কেঁদো না। আল্লাহই তোমার পিতার হিফাযতকারী"। তিনি আরও বলেন, "যতদিন আমার চাচা আবু তালিব জীবিত ছিলেন ততদিন কুরাইশরা আমার সাথে এত খারাপ ব্যবহার করেনি যা আমার সহ্যের বাইরে ছিল"।

এভাবে একের পর এক দুঃখ-কষ্টের ভেতর দিয়ে যাওয়ার কারণে রাসূল সাঃ এর বছরটির নাম দেন- আমুল হুযন' বা দুঃখের বছর।

## তায়েফ গমন

আবু তালিবের মৃত্যুর পর কুরাইশরা নবীজি ﷺ এর ওপর নির্যাতন বাড়িয়ে দেয়। তারা তাঁকে কষ্ট দেওয়ার কোনো সুযোগ হাতছাড়া করত না। যখন মক্কাবাসীর ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে আশার আলো ক্ষীণ হয়ে এল, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তায়েফে দাওয়াত দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর সঙ্গী ছিলেন যায়েদ ইবন হারিসা রা.। তায়েফে গিয়ে তিনি সাক্বীফ গোত্রের তিন নেতার সাথে দেখা করেন এবং তাদের দ্বীনের দিকে আহ্বান জানান।

কিন্তু এই নেতাদের প্রতিক্রিয়া ছিল অত্যন্ত অপমানজনক। একজন বলল, 'তুমি যদি আল্লাহর রাসূল হও, তাহলে আমি কাবার গিলাফ ছিঁড়ে ফেলব।' আরেকজন বলল, 'আল্লাহ কি তোমার চেয়ে ভালো কাউকে খুঁজে পাননি?' তৃতীয়জন বলে, 'তোমার সাথে কথা বলার মতো যোগ্যতা আমার নেই। তুমি যদি সত্যিই নবী হও, তবে আমি তোমার সমকক্ষ নই। আর তুমি যদি মিথ্যাবাদী হও, তবে মিথ্যাবাদীর সাথে কথা বলা অযথা।'

তাইফের সাধারণ মানুষের প্রতিক্রিয়া ছিল আরও ভয়াবহ। দশ দিন ধরে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের কাছে দাওয়াত পৌঁছে দেন, কিন্তু তারা প্রতিবারই তাঁকে উপহাস করে প্রত্যাখ্যান করে। বিদায়ের সময় তিনি তাদের কাছে শুধু এটুকু বলেছিলেন যে, 'আমাদের আলোচনার কথা যেন মক্কায় প্রকাশ না হয়।' কিন্তু তারা এর বদলে উচ্ছৃঙ্খল তরুণদের রাসূলুল্লাহর ﷺ পেছনে লেলিয়ে দেয়। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও যায়েদ ইবন হারিসা রা.-কে পাথর মেরে আহত করে এবং তাদের ধাওয়া করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং যায়েদ রা. এক বাগানে গিয়ে আশ্রয় নেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দেহ রক্তাক্ত হয়ে পড়েছিল, পায়ের রক্তে জুতো পর্যন্ত ভিজে গিয়েছিল।

বাগানে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত কষ্ট আর হতাশা নিয়ে আল্লাহর কাছে একটি আবেগময় দোয়া করেন, যা মুস্তাদআফিনের দোয়া নামে পরিচিত।

*'হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে আমার দুর্বলতা, অসহায়ত্ব এবং মানুষের কাছে আমার মূল্যহীনতা সম্পর্কে অভিযোগ জানাচ্ছি। হে দয়ালু প্রভু, তুমি দুর্বলদের রব, তুমি আমারও রব। তুমি আমাকে কার হাতে ছেড়ে দিয়েছ? এমন কারো হাতে, যে আমার প্রতি রুক্ষ হবে? নাকি এমন শত্রুর হাতে, যে আমাকে দমন করবে? যদি তুমি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হও, তবে আমার কোনো দুঃখ নেই, আফসোসও নেই । তোমার ক্ষমাশীলতা আমার জন্য প্রশস্ত ও প্রসারিত কর। আমি তোমার ক্রোধ থেকে এবং তোমার অসন্তুষ্টি থেকে আশ্রয় চাই। তোমার সে আলোয় আশ্রয় চাই যা দ্বারা সকল অন্ধকার দূর হয়ে যায়। দুনিয়া এবং আখিরাতের সকল*

*বিষয় তোমার হাতে ন্যস্ত। সকল ক্ষমতা এবং শক্তি শুধু তোমারই। তোমরা শক্তি ছাড়া আর কোন শক্তি নেই।'*

আল্লাহ তাআলা এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্য সাহায্য পাঠান। ওই বাগানটি ছিল মক্কার দুই ধনীর মালিকানাধীন। তারা তাদের খ্রিস্টান ক্রীতদাস আদ্দাসকে রাসূলুল্লাহর ﷺ জন্য আঙ্গুর নিয়ে যেতে বলে। খ্রিস্টান ক্রীতদাস আদ্দাস রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্য আঙ্গুর নিয়ে যান। রাসূলুল্লাহ ﷺ খাওয়ার আগে 'বিসমিল্লাহ' বলেন। আদ্দাস বিস্মিত হয়ে বলেন, 'এদেশের লোকেরা এমন কথা বলে না।' রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কোথা থেকে এসেছ? তোমার ধর্ম কী?' আদ্দাস বললেন, 'আমি খ্রিস্টান। আমার বাড়ি ইরাকের নিনেভাতে।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তুমি ইউনুস ইবন মাত্তার গ্রাম থেকে এসেছ। তিনি আল্লাহর নবী ছিলেন।' আদ্দাস বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি ইউনুস সম্পর্কে কীভাবে জানলেন?' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'তিনি আমার ভাই। তিনি নবী ছিলেন, আমিও নবী।'

এ কথা শুনে আদ্দাস রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রতি ভালোবাসায় আবেগাপ্লুত হয়ে তাঁর হাত, পা ও মাথায় চুম্বন করেন। জমির মালিকেরা এ দৃশ্য দেখে অসন্তুষ্ট হয়ে আদ্দাসকে সতর্ক করে বলে, 'তুমি তাঁর কথায় প্রভাবিত হয়ে নিজের ধর্ম ত্যাগ করো না। আমাদের ধর্ম তাঁর ধর্মের চেয়ে উত্তম।' কিন্তু আদ্দাস জানতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেছেন তা একজন নবীর কথাই হতে পারে।

## ইসরা ওয়াল মিরাজ

### ইসরা:

'ইসরা' অর্থ 'রাত্রিকালীন ভ্রমণ'। রাসূল ﷺ আল্লাহর নির্দেশে জিবরীল আঃ এর সাথে একটি বাহনের পিঠে বসে মাসজিদুল হারাম থেকে মাসজিদুল আকসা পর্যন্ত যে নৈশকালীন ভ্রমণ করেছিলেন তাকে বলা হয় 'ইসরা'। আল্লাহ কুরআনে ইসরা-র প্রসংগ তুলে ধরেন,
*পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যান্ত-যার চার দিকে আমি পর্যাপ্ত বরকত দান করেছি যাতে আমি তাঁকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। নিশ্চয়ই তিনি পরম শ্রবণকারী ও দর্শনশীল। (সূরা ইসরা, ১৭:১)*

## মিরাজ:

'মিরাজ' অর্থ 'উপরে আরোহনের মাধ্যম' বা 'সিঁড়ি'। আল্লাহ তাঁর হাবীব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভূমি থেকে আকাশে আরোহণ করিয়ে প্রথম আকাশ থেকে শুরু করে সপ্তাকাশ ভেদ করে সিদরাতুল মুন্তাহা পেরিয়ে তাঁর নিজের কাছে ডেকে নিয়েছিলেন। সেটাকেই প্রচলিত অর্থে মি'রাজ বলা হয়।

## ইসরা ও মিরাজের পটভূমি:

রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর কষ্টের সময়ের পর আল্লাহর কাছ থেকে অনন্য সাধারণ উপহার লাভ করেছেন। কষ্টের পরিমাণ যত বেশি হবে তার সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে অনুগ্রহের পরিমাণও অনেক বেশি হবে। এই অনুগ্রহ হলো ইসরা ওয়াল মিরাজের ঘটনা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আমি তখন আল-হিজরে ছিলাম। আমার কাছে একজন ফেরেশতা আসেন। তিনি আমার বুক উন্মুক্ত করে হৃদয় বের করেন। ঈমানে পরিপূর্ণ স্বর্ণের পাত্রে তা ধুয়ে আমার বক্ষে পুনঃস্থাপন করেন। এরপর আমার সামনে একটি জন্তু (বুরাক) আনা হয়, যা আকৃতিতে ঘোড়ার চেয়ে ছোট এবং গাধার চেয়ে বড় ছিল। জন্তুটি এক লাফে দৃষ্টিসীমার শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যেত।"

জিবরাইল আ. নবীজিকে সেই বাহনে উঠতে বলেন এবং তাঁকে পথ দেখিয়ে বায়তুল মাকদিসে নিয়ে যান। সেখানে নবীজি ﷺ মসজিদে প্রবেশ করে দুই রাকাত সালাত আদায় করেন। এ সময় অন্যান্য নবী-রাসূলগণও উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের নিয়ে সালাতের ইমামতি করেন রাসূলুল্লাহ ﷺ।

এরপর জিবরাইল আ. নবীজিকে প্রথম আসমানের দরজায় নিয়ে যান। দরজার প্রহরীরা পরিচয় জেনে আনন্দের সঙ্গে তাঁকে স্বাগত জানান। সেখানে তিনি তাঁর পিতা আদম আ.-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। জিবরাইল আ. বলেন, "ইনি আপনার পিতা আদম আ., তাঁকে সালাম দিন।" নবীজি ﷺ সালাম দিলে আদম আ. উত্তর দেন এবং নবীজি ﷺ-কে শুভেচ্ছা জানান। আদম আ. তাঁর কোটি কোটি সন্তানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান মুহাম্মাদ ﷺ-কে দেখে আনন্দিত হন।

এরপর দ্বিতীয় আসমানে নবীজি ﷺ ঈসা আ. ও ইয়াহইয়া আ.-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তৃতীয় আসমানে যান এবং সেখানে ইউসুফ আ.-কে দেখতে পান, যাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে, "তাঁকে

দুনিয়ার সৌন্দর্যের অর্ধেক দেওয়া হয়েছে।" চতুর্থ আসমানে ইদ্রিস আ., পঞ্চম আসমানে হারুন আ. এবং ষষ্ঠ আসমানে মূসা আ.-এর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়।

মূসা আ. নবীজি ﷺ-কে দেখে সালাম বিনিময়ের পর কাঁদতে শুরু করেন। কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, "এক যুবককে আমার পরে রিসালাতের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, কিন্তু জান্নাতে তাঁর অনুসারীর সংখ্যা আমার চেয়ে বেশি হবে।" মূসা আ.-এর সময় বনী ইসরাইল ছিল সবচেয়ে বৃহৎ জাতি, কিন্তু মুহাম্মাদ ﷺ-এর উম্মাহর সংখ্যা তাঁদের থেকেও বেশি হবে। এ কারণে মূসা আ. কেঁদেছিলেন। তবে এ প্রতিযোগিতায় কোনো ঈর্ষা বা হিংসা ছিল না, বরং এটি ছিল এক গভীর উপলব্ধি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "এরপর আমাকে সপ্তম আসমানে নেওয়া হলো। সেখানে আমি আমার পিতা ইবরাহীম আ.-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম এবং তাঁর সাথে সালাম বিনিময় করলাম। এরপর আমাকে বাইতুল-মা'মুর দেখানো হলো, যা ফেরেশতাদের ইবাদত করার স্থান।"

তিনি আরো বলেন, "আমি সিদরাতুল মুনতাহা দেখলাম। এটি আসমানের শেষ প্রান্তে অবস্থিত একটি গাছ, যার পরেই শুরু হয় আখিরাতের জীবন, জান্নাত এবং আল্লাহ তাআলার 'আরশ। সিদরাতুল মুনতাহা থেকে চারটি নদী প্রবাহিত হচ্ছে। দুইটি নদী দৃশ্যমান, সেগুলো হল নীলনদ এবং ইউফ্রেটিস, এবং দুটি নদী লুকোনো, যা জান্নাতের নদী।"

তিনি সিদরাতুল মুনতাহা অতিক্রম করে আরও উপরে ওঠেন এবং শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার নির্দেশ দেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আমি ফেরত আসছিলাম, পথে মূসা আ. আমার সাথে দেখা করলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ আপনাকে কী বলেছেন? আমি বললাম, আল্লাহ তাআলা আমার উম্মাতকে পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার হুকুম দিয়েছেন।" মূসা আ. বললেন, "আপনার উম্মত তা পালন করতে পারবে না। আপনি আল্লাহ তাআলাকে অনুরোধ করুন, সালাতের সংখ্যা কমিয়ে দিতে।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তাআলার কাছে ফিরে গিয়ে সালাতের সংখ্যা কমানোর জন্য প্রার্থনা করেন এবং একে একে দশ, আরও দশ, তারপর আরো দশ কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত নির্ধারণ করা হয়। মূসা আ. আবারও কমানোর জন্য আল্লাহ তাআলাকে বলার পর, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আবার অনুরোধ করতে আমি লজ্জা পাচ্ছি। আমি আর পারবো না।"

এদিকে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি কণ্ঠস্বর শুনলেন, "এটাই আপনার উম্মাতের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে হবে, তবে এর জন্য পঞ্চাশ ওয়াক্তের পুরস্কার দেওয়া হবে।"

সেই একই রাতে তিনি দুনিয়াতে ফেরত আসেন। পরদিন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উম্ম আয়মানের কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। তিনি বলেন, “আমি রাতেই জেরুসালেম গিয়ে ফিরে এসেছি।” উম্ম আয়মান তাঁকে বললেন, “এ কথা আপনি কাউকে বলবেন না, কেউ বিশ্বাস করবে না।” তবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “না, আমি সবাইকে জানাবো, সত্য ঘটনা প্রচার করতে পিছপা হবো না।”

অল্প সময়ের মধ্যে, এ ঘটনা আবু জাহেলের কাছে পৌঁছে যায়। আবু জাহেল রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মসজিদে ডেকে আনলেন এবং লোকজনের সামনে তাঁর কথাটি পুনরায় বলতে বললেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনও দ্বিধা ছাড়াই বললেন, “আমি গত রাতে জেরুসালেম গিয়ে ফিরে এসেছি।”

লোকেরা এতে হাসাহাসি করতে লাগলো এবং শিস বাজিয়ে অবজ্ঞা করল। তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জেরুসালেমের বিস্তারিত বর্ণনা দিতে বললো। রাসূলুল্লাহ ﷺ সঠিকভাবে বর্ণনা করতে শুরু করলেন এবং অবাক করে দিয়ে, তিনি সকলের জন্য সঠিক বর্ণনা দিলেন।

বর্ণনার এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তিনি একটি কাফেলা দেখেন, যার উট হারিয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের বললেন, "তোমাদের হারানো উট এখানে আছে।" তারা অবাক হয়ে গেল, এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের কাছ থেকে পানি খেয়েছিলেন। পরে, তাদের কাফেলার লোকেরা যাচাই করতে গিয়ে দেখলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যা বলেছেন, তা সব সঠিক।

তবে, এমন সব নিদর্শন এবং প্রমাণ সত্ত্বেও, কুরাইশরা এই ঘটনার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেনি। মিরাজের ঘটনাটি এতটাই অস্বাভাবিক ছিল যে কিছু দুর্বল ঈমানের মুসলিমও মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীদেরকে এমন মু'জিযা প্রদর্শন করেন, যা একমাত্র তাঁরা সহ্য করতে পারেন।

## আবু বকর রা: এর ‘সিদ্দীক’ উপাধি লাভ:

কুরাইশদের কিছু লোক আবু বকরের কাছে এসে বলল, "তোমার বন্ধু বলছে সে নাকি এক রাতে বায়তুল মুকাদ্দাসে গিয়েছিল আবার ভোর হওয়ার আগেই সেখান থেকে ঘুরে এসেছে। তুমি কি তার এই কথা সত্য বলে মেনে নেবে?" তিনি পাল্টা জিজ্ঞেস করলেন, "রাসূল ﷺ কি সত্যি এ কথা বলেছেন?" তারা বলল, "হ্যাঁ"। তখন আবু বকর বললেন, "যদি তিনি একথা বলে থাকেন তবে সত্যই বলেছেন, আমি তা বিশ্বাস করি। তিনি এর চেয়ে বেশি যে আসমানী বার্তা ওহীর কথা বলেন আমি তো সেটাই বিশ্বাস করি, তাহলে এ আর এমন কী?" সেদিন থেকেই আবু বকরের উপাধি হয়ে যায় 'সিদ্দিক' (অতীব সত্যতার অধিকারী)।

## বিভিন্ন গোত্রের প্রতি আহবান

তায়েফ থেকে ফেরার পর রাসুল ﷺ বিভিন্ন গোত্রের কাছে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে যান। রাসুল ﷺ মক্কায় ১০ বছর অবস্থান করেছেন। আরবের এমন কোনো মজলিস ও সভা নেই, যেখানে গিয়ে সত্যের দাওয়াত দেননি। উকাজ, মজান্না, মিনাসহ বিভিন্ন লোকসমাগম এ গিয়ে তিনি ইসলামের দাওয়াত দিতেন। তিনি তাদের সামনে ইসলাম তুলে ধরেন এবং তাদের কাছে আশ্রয় ও সামরিক সাহায্যের অনুরোধ করেন। এভাবে ইসলামের প্রচারকাজ অব্যাহত রাখেন। ব্যবসায়িক মৌসুমে এবং হজের মৌসুমে বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা একত্র হতো। রাসুল সেখানে ছুটে যেতেন। তাদের সম্মুখে নিজের রাজনৈতিক ও দাওয়াতি দর্শন তুলে ধরতেন। সঙ্গে থাকতেন আবু বকর রা.। দুজনে একসঙ্গে প্রতিটি গোত্রের প্রধান ও সরদারদের কাছে উপস্থিত হতেন। আবু বকর রা. আরবদের বংশতালিকা ও ইতিহাস সম্পর্কে ভালো জানতেন। কারণ, বংশীয় মর্যাদা এবং সম্মানের দিক থেকে আবু বকর আরবের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন। রাসূল ﷺ সামরিক সাহায্য কামনার আগে আবু বকর রা. তাদের জিজ্ঞাসা করতেন, 'তোমাদের সংখ্যা কত? তোমাদের নিরাপত্তাব্যবস্থা কেমন? তোমাদের যুদ্ধগুলোর কী হাল?' এরপর রাসূল ﷺ তাদের সামনে দীনের দাওয়াত
উপস্থাপন করতেন।

মাকরিজি রাহ. বলেন, এরপর বিভিন্ন মৌসুমে আরবের বিভিন্ন গোত্রের সম্মুখে তিনি নিজেকে উপস্থাপন করেন। তাদের ইসলামের প্রতি আহ্বান করেন। বনু আমের, বনু গাসসান, বনু ফাজারাহ, বনু মুররা, বনু হানিফা, বনু সালিম, বনু আবাস, বনু নাসর, সালাবা ইবনু উকাবা, কিনদাহ, কালব, বনু হারিস, বনু আজরাহ, কায়েস ইবনুল খাতিম, আবুল ইউসার আনাস ইবনু আবি রাফিসহ অনেককে ইসলামের দাওয়াত দেন।

ওয়াকিদি একটি একটি করে সকল গোত্রের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লেখেন, নবিজি কিনদাহ গোত্র থেকে দাওয়াত শুরু করেছিলেন। এরপর বনু কালব, এরপর বনু হানিফার কাছে যান। এরপর বনু আমেরকে দাওয়াত দেন। রাসুল ﷺ বললেন, 'কে আছে আমাকে তার কওমের কাছে নিয়ে যাবে এবং আমাকে নিরাপত্তা দেবে? আমি আমার রবের বার্তা তাদের কাছে পৌঁছে দেবো। কুরাইশরা আমাকে দীনের দাওয়াত দিতে বাধা দিচ্ছে।' আবু লাহাব পেছনে ছিল। চিৎকার করে বলল, 'এর কথায় কান দিয়ো না। নিঃসন্দেহে সে মিথ্যুক।'

আবু জাহল এবং আবু লাহাব-তাদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক, তাঁকে বাজারে বা জনসম্মুখে পেলেই কষ্ট দিত। অন্যদের থেকে এ ক্ষেত্রে তারা ছিল অধিক অগ্রগামী।

## আওস ও খাযরাজের ইসলামে প্রবেশ:

ইবন ইসহাক আল-আনসারদের ইসলামে আসার কাহিনি বর্ণনা করেছেন। আল- আনসার ছিল দুটি গোত্র আল আওস এবং আল খাযরাজ। এ দুটো গোত্র ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে তাদেরকে একসাথে বলা হতো আল-আনসার, 'আনসার' মানে রক্ষক। এ দুটি আরব গোত্র মদীনায় থাকত, কাহতান শাখার বংশধর। আরবরা আদনান ও কাহতান নামক দুইটি অংশে বিভক্ত ছিল। ইয়েমেনের আরবদেরকে কাহতান বলা হতো, আর আদনান হলো ইসমাঈলের বংশধর। আওস ও খাযরাজ গোত্রের সাথে মদীনাতে তখন তিনটি ইহুদি গোত্র বাস করতো বনু নাযির, বনু কাইনুকা ও বনু কুরাইযা। মদীনা শহরটির ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থান ছিল অন্যান্য শহর থেকে আলাদা, এর তিনদিক ঘেরাও ও নিরাপদ ছিল। পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ছিল পাথুরে রাস্তা। সেখান দিয়ে মদীনা আক্রমণ করা সম্ভব ছিল না, আর দক্ষিণ দিক কৃষিজমির গাছগাছালিতে ভরা ছিল। সুতরাং শুধুমাত্র উত্তর দিক থেকে শত্রুপক্ষ মদীনাকে আক্রমণ করতে পারত।

রাসূলুল্লাহ ﷺ হাজ্জে আগত খাযরাজ গোত্রের ছাউনিতে গেলেন। ভেতরে ঢুকে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন,

- আপনারা কারা?

- আমরা আল খাযরাজ গোত্র থেকে এসেছি।

- আপনাদের সাথে কি ইহুদিদের মিত্রতা আছে?

- হ্যাঁ, আছে।

- আচ্ছা, আমি কি আপনাদের সাথে কিছু কথা বলতে পারি?

তারা রাজি হলো। রাসূলুল্লাহ তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ কথা শোনার প্রতি তাদের খুবই আগ্রহ ছিল। তারা ইসলামের দাওয়াত পেয়েই তা গ্রহণ করলো এবং বললো,

"আমরা আমাদের দেশ ছেড়ে এসেছি কারণ তাদের মধ্যে প্রচণ্ড শত্রুতা আর রেষারেষি লেগেই আছে, এমনটি আর কোথাও পাবেন না। হয়তোবা আল্লাহ তাআলা আপনার মাধ্যমে তাদেরকে আবার একত্রিত করতে পারেন। আমরা তাদের কাছে গিয়ে এই দ্বীন ইসলামের কথা তাদের কাছে তুলে ধরব। যদি আল্লাহ আপনার মাধ্যমে তাদেরকে একত্রিত করে দেন, তাহলে আপনার চেয়ে প্রিয় মানুষ আমাদের চোখে আর কেউ হবে না।

ছয়জনের এই ছোট্ট দলটি কোনো প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই ইসলামের দাওয়াত পাওয়ামাত্রই তা গ্রহণ করে নিয়েছিল যা অন্য আরব গোত্ররা করেনি। ছয়জন ছিলেন,

১. আবু উমামা আসআদ ইবন জুরারা

২. বনু নাজ্জারের আউফ ইবন হারিস

৩. রাফি ইবন মালিক

৪. কুতাবা ইবনু আমের

৫. উকবা ইবন আমের

৬. জাবির ইবন আবদিল্লাহ ইবন রিআব

# আকাবার প্রথম ও দ্বিতীয় বায়আত

## আকাবার প্রথম বায়আত:

প্রথমবার সাক্ষাতের একবছর পর অর্থাৎ নবুওয়াতের একাদশ বছরে হজের মৌসুমে মদিনার ১২ জন ব্যক্তি রাসুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং রাসুলের ﷺ হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। ইতিহাসে একে আকাবার প্রথম বায়আত হিসেবে অভিহিত করা হয়। আগত ১২ জনের ১০ জন ছিলেন খাজরাজের, ২ জন আউস গোত্রের। এর দ্বারা বোঝা যায়, বিগত বছর খাজরাজের যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করে গিয়েছিলেন, তাঁরা নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে পূর্ণোদ্যমে দাওয়াতের কাজ করেছেন। তাঁরা কেবল আপন গোত্রে দাওয়াত দিয়ে ক্ষান্ত থাকেননি; শত্রু আউস গোত্রেও দাওয়াত দিয়েছেন এবং তাদের কিছু ব্যক্তিকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁদের এই কল্যাণপ্রচেষ্টার মাধ্যমেই মূলত আউস-খাজরাজ ঐক্যের শুভ সূচনা হয়। এভাবে আকাবার প্রথম বায়আত সম্পন্ন হয়।

উবাদা ইবনু সামিত আকাবার প্রথম বায়আতের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমরা ছিলাম ১২ জন। রাসুল ﷺ আমাদের থেকে 'বায়আতুন নিসা'র বায়আত নেন। তখনো পর্যন্ত জিহাদের হুকুম অবতীর্ণ না হওয়ায় এই বিষয়গুলোর ওপর বায়আত করা হয়। রাসুল ﷺ বায়আত নেন আমরা যেন আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক না করি। চুরি, ব্যভিচার এবং সন্তানদের হত্যা না করি। কারও ব্যাপারে যেন অপবাদ আরোপ না করি। সৎকাজের বিরোধিতা যেন না করি। রাসুল ﷺ বলেন, 'যদি তোমরা এগুলো মানতে পারো তাহলে তোমাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। অবাধ্যতা করলে তোমাদের ব্যাপারটি আল্লাহর হাতে। চাইলে তিনি তোমাদের শাস্তি দেবেন। আবার চাইলে ক্ষমা করে দেবেন।

বায়আতে যেসব বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয় পরবর্তীকালে সেসব বিষয়ে নারীদের বায়আত গ্রহণ করা হয়। ফলে তা 'বায়আতুন নিসা' হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। রাসুল বায়আতকারীদের সঙ্গে মুসআব ইবন উমায়ের রা.-কে পাঠান। তিনি তাঁদের কুরআন শিক্ষা দিতেন এবং সালাতের ইমামতি করতেন। মদিনাতে তাঁর নাম পড়ে যায় 'মুকরি' (শিক্ষক)।

# আকাবার দ্বিতীয় বায়আত:

ইসলামের প্রথম বায়াত অনুষ্ঠিত হয়েছিল আল-আক্বাবায়, এই ঘটনা বায়াত আল উলা নামে পরিচিত। মদীনায় ইসলাম প্রচারে মুসআব ইবন উমায়ের রা.অসামান্য অবদান রেখেছিলেন। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে মানুষ সেখানে ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে এবং পরবর্তী হাজ্জ মৌসুম চলে আসার আগে এমন অবস্থা হয় যে মদীনার প্রতিটি বাড়িতে একজন হলেও ইসলাম গ্রহণ করে। হাজ্জের সময় রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে মদীনার নও-মুসলিমদের সাক্ষাতের নির্ধারিত সময় ঘনিয়ে আসলো। সত্তরের অধিক মুসলিম নিজ গোত্রের লোকেদের সাথে হাজ্জের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। মদীনা থেকে আসা প্রতিনিধি দলটির সাথে মুসলিম ও অমুসলিম উভয়েই ছিল। যদিও গোপন বৈঠকটি ছিল শুধুমাত্র মুহাম্মাদ ﷺ ও মুসলিমদের মধ্যে, কিন্তু তাঁরা মদীনা থেকে যাত্রা করার সময় তাঁরা তাদের গোত্রের অমুসলিম সদস্যদের সাথে একসাথে এসেছেন। রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে সাক্ষাত করতে আসে সত্তরের অধিক মুসলিম পুরুষ ও দুইজন মুসলিম নারী। এ সময় রাসুল সাঃ এর সাথে ছিলেন চাচা আব্বাস ইবন আবদুল মুত্তালিব। তখনো তিনি মুশরিক ছিলেন। আনসাররা রাসুল ﷺ কে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আপনি আমাদের থেকে কি চান?’ রাসুল ﷺ বললেন,

‘তোমরা অঙ্গীকার করো, ভালো-মন্দ সকল অবস্থায় আমার কথা শুনবে এবং মানবে। সচ্ছলতা, অসচ্ছলতা সর্বাবস্থায় আল্লাহর পথে ব্যয় করবে। সৎ কাজের আদেশ আর অসৎ কাজে নিষেধ করবে। আল্লাহর পথে হক্ক কথা বলে যাবে এবং এ ব্যাপারে কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে পরোয়া করবে না। আমি যদি তোমাদের কাছে আসি তাহলে আমাকে সাহায্য করবে। আমাকে হেফাযত করবে সেভাবে, যেভাবে তোমরা নিজেদেরকে, নিজেদের স্ত্রী ও সন্তানদের হেফাযত করো।’

এই অঙ্গীকার আকাবার প্রথম বাইআতের অঙ্গীকারের চেয়ে একধাপ বেশি। তখন তারা কেবল মুসলিম হওয়ার অঙ্গীকার করেছিল। আর দ্বিতীয় বাইআত ছিল রাসুল ﷺ কে নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া। এটি ছিল আত্মরক্ষামূলক প্রতিরোধ।

# মদিনায় হিজরতের পটভূমি

## হিজরতের সূচনা:

কুরাইশরা এই বায়আত সম্পর্কে জানতে পেরে তাদের ক্রোধের অন্ত রইল না। এ পর্যায়ে তারা মুসলিমদের কষ্ট ও নির্যাতনের কোনো পন্থাই আর বাকি রাখেনি। তখন নবিজি ﷺ সাহাবিদের মদিনায় হিজরত করতে বলেন। ফলে সাহাবিরা কুরাইশদের দৃষ্টি এড়িয়ে গোপনে একজন-দুজন করে মক্কা থেকে মদিনায় যেতে থাকেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত মক্কায় নবিজি ﷺ, আবু বকর, আলি রা. এবং কয়েকজন দুর্বল লোক ছাড়া আর কোনো মুসলমানই বাকি থাকেননি। আবু বকরও হিজরতের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন; কিন্তু নবিজি ﷺ তাঁকে বলেন, 'এখন থেকে যাও, যতক্ষণ-না আল্লাহ আমাকেও হিজরতের অনুমতি দিচ্ছেন।' ফলে তিনি নবিজির ﷺ হিজরতের নির্দেশ আসার অপেক্ষা করতে থাকেন এবং এ সফরের উদ্দেশ্যে দুটি উটও প্রস্তুত করেন। এর একটি নিজের জন্য এবং অন্যটি নবিজির জন্য।

## মদিনায় নবিজির হিজরত:

কুরাইশের কাফিররা যখন সামগ্রিক বিষয় জানতে পারে, তখন তারা নবিজির ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে 'দারুন নাদওয়ায়' সমবেত হয়। দারুন নাদওয়ার সেই বৈঠকে কেউ কেউ তাঁকে বন্দির পরামর্শ দেয়; আর কেউ দেয় দেশান্তরের পরামর্শ। তবে তাদের ধূর্ত লোকেরা বলে, এগুলোর কোনোটিই করা উচিত হবে না। কেননা, বন্দি করা হলে তাঁর সমর্থক ও সাথিরা আমাদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে তাঁকে ছাড়িয়ে নেবে; আর দেশান্তর করা হলে তা হবে আমাদের জন্য একেবারেই ক্ষতিকর। কেননা, এমতাবস্থায় মক্কার আশেপাশের সকল আরব তাঁর উত্তম চরিত্র, মিষ্টি কথা এবং পবিত্র কালামের অনুরক্ত হয়ে যাবে এবং তিনি তাদের সবাইকে নিয়ে আমাদের ওপর আক্রমণ করে বসবেন।

তখন হতভাগা আবু জাহল পরামর্শ দেয় যে, তাঁকে হত্যা করা হোক। তবে এ হত্যায় সব গোত্রের একজন করে লোক অংশ নেবে, যাতে বনু আবদি মানাফ (নবিজি-এর গোত্র) এ হত্যার প্রতিশোধ নিতে না পারে। তখন উপস্থিত সবাই তার এ প্রস্তাব পছন্দ করে এবং সব গোত্র থেকে একজন করে যুবককে এ কাজের জন্য নিযুক্ত করা হয়। তাদের বলে দেওয়া হয় যে, অমুক রাতে এ কাজ সম্পন্ন করা হবে।

এদিকে আল্লাহ তাআলা নবিজিকে তাদের এই ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে দেন এবং তাঁকে দ্রুত হিজরতের নির্দেশ দেন। যে রাতে বিভিন্ন গোত্রের বহু যুবক কাফিরদের হীন ষড়যন্ত্র

বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে নবিজির ঘরের চারদিক ঘেরাও করে, ঠিক সে রাতেই নবিজি ﷺ হিজরতের সিদ্ধান্ত নেন। এ সময় তিনি আলিকে বলেন, তিনি যেন তাঁর খাটে চাদরমুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকেন, যাতে কাফিররা এটা জানতে না পারে যে, তিনি ঘরে নেই।

এরপর নবিজি ﷺ যখন ঘর থেকে বের হন, তখন তাঁর দরজায় কাফিরদের যেন মেলা জমে। তিনি সুরা ইয়াসিন পড়তে পড়তে ঘর থেকে বের হন এবং فَأَغْشَيْنَٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبصرون (আমি তাদের চোখে পর্দা ফেলে দিয়েছি, ফলে তারা দেখতে পায় না।) এই আয়াত পর্যন্ত যখন পৌঁছান, তখন আয়াতটি কয়েকবার তিলাওয়াত করেন। ফলে আল্লাহ তাআলা কাফিরদের চোখে পর্দা ফেলে দেন। তারা আর নবিজিকে দেখতে পায়নি। এরপর তিনি আবু বকরের বাড়িতে যান। আবু বকর আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন এবং একজন
পথপ্রদর্শকও প্রস্তুত করে রাখেন।

এভাবে সিদ্দিকে আকবর রা. নবিজির সঙ্গী হন এবং তাঁরা উভয়ে বাড়ির পেছন দিকের ছোট একটি দরজা দিয়ে বেরিয়ে সাওর পাহাড়ের দিকে এগিয়ে যান।

## সাওর গুহায় অবস্থান:

এবার নবিজি ﷺ আবু বকর রা.-কে নিয়ে সাওর পাহাড়ের একটি গুহায় অবস্থান নেন। এদিকে কুরাইশ যুবকরা নবিজির ঘরের বাইরে সকাল পর্যন্ত এ অপেক্ষা করে যে, নবিজি কখন ঘর থেকে বেরোবেন। পরে তারা যখন জানতে পারে, নবিজির বিছানায় আলি শুয়ে আছেন, তখন বেশ অবাক হয় এবং চতুর্দিকে নবিজির সন্ধানে নিজেদের গুপ্তচর পাঠায়। কুরাইশরা এ সময় ঘোষণা দেয়, যে নবিজিকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসতে পারবে, তাকে উপহার হিসেবে ১০০ উট দেওয়া হবে। এ ঘোষণার পর বহু লোক পুরস্কারের আশায় নবিজিকে খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে। এমনকি পদচিহ্নবিষয়ে অভিজ্ঞ কতেক ব্যক্তি নবিজির পায়ের চিহ্ন ধরে খুঁজতে খুঁজতে ঠিক সেই গুহার একেবারে কাছে পৌঁছে যায়। সামান্য একটু নুয়ে তাকালেই তারা নবিজিকে ﷺ পরিষ্কার দেখতে পেত। এ সময় আবু বকর রা. বিচলিত হয়ে পড়েন। নবিজি তাঁকে বলেন, 'ভয় পেয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন।'

আল্লাহর কী মহিমা! কাফিরদের দৃষ্টি তখন গুহা থেকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং কেউ এতটুকুও ঝুঁকে তাকায়নি; বরং তাদের মধ্যে সবচেয়ে ধূর্ত ব্যক্তি উমাইয়া ইবনু খালফ বলে ওঠে, 'এখানে তাঁর থাকাটা অসম্ভব।' কেননা, আল্লাহর নির্দেশে তখন গুহার প্রবেশপথে

মাকড়সা রাতারাতি জাল বুনে রেখেছিল এবং বন্য কবুতর কোথা থেকে গুহার ঠিক প্রবেশপথে বাসা তৈরি করে ফেলেছিল!

রাসুল ﷺ ও আবু বকর এ গুহায় একটানা তিন রাত আত্মগোপন করে থাকেন। একপর্যায়ে অন্বেষণকারীরা নিরাশ হয়ে ফিরে যায়।

এই তিন দিনই রাতের অন্ধকারে আবু বকরের ছেলে আবদুল্লাহ রা. গোপনে তাঁদের কাছে যেতেন এবং ভোর হওয়ার আগেই আবার মক্কায় ফিরে আসতেন। দিনভর কুরাইশদের সংবাদ সংগ্রহ করে রাতে নবিজির ﷺ কাছে তা বর্ণনা করতেন। অপরদিকে তাঁর বোন আসমা বিনতু আবু বকর প্রতিরাতে তাঁদের কাছে খাবার পৌঁছে দিতেন। যেহেতু আরবের লোকেরা পদচিহ্ন সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখত, তাই পদচিহ্নগুলো যেন মুছে যায়, এই উদ্দেশ্যে আবদুল্লাহ রা তাঁর গোলামকে বলে রেখেছিলেন, সে যেন প্রতিদিন বকরি চরাতে চরাতে গুহা পর্যন্ত নিয়ে যায়, যেন তাদের পায়ের চিহ্ন মুছে যায়।

## সাওর গুহা থেকে মদিনার পথে:

সাওর গুহায় অবস্থানের তৃতীয় দিন ৪ রবিউল আউয়াল সোমবার আবু বকর রা.- এর আজাদকৃত গোলাম আমির ইবনু ফুহায়রা রা. সেই উট দুটি নিয়ে উপস্থিত হন, যেগুলোকে এই সফরের জন্যই তিনি প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনু উরাইকিতও গিয়ে উপস্থিত হন, যাঁকে তিনি পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পথ দেখাতে সঙ্গে নিয়েছিলেন।

## সুরাকার উপস্থিতি ও তার ঘোড়া মাটিতে ধেবে যাওয়া:

নবিজি ﷺ মদিনার পথে এগিয়ে যাচ্ছেন, এমন সময় কুরাইশ কাফিরদের দূত সুরাকা ইবনু মালিক নবিজিকে খুঁজে ফিরছিল। একপর্যায়ে সে নবিজির সন্ধান পেয়ে তাঁর পিছু নেয়। এমনকি তাঁর একেবারে কাছে পৌঁছে যায়। এভাবে সুরাকা যখন নবিজির একেবারে নাগালে চলে আসে, তখন তার ঘোড়াটি হোঁচট খায়। ফলে সে ঘোড়া থেকে পড়ে যায়। পুনরায় ঘোড়ায় চড়ে নবিজির পেছনে ধাওয়া করে এবং এত কাছে চলে আসে যে, নবিজির কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ সে শুনতে পাচ্ছিল। এ সময় আবু বকর রা. বার বার পেছনে তাকিয়ে তার গতিবিধি লক্ষ করছিলেন; কিন্তু নবিজি তাঁর দিকে ফিরেও তাকাচ্ছেন না। যখন সে একেবারে কাছে এসে পড়ে, তখন মরুভূমির শুষ্ক ও শক্ত মাটিতে তার ঘোড়ার চারটি পা হাঁটু পর্যন্ত ধেবে যায়। ফলে সুরাকা আবারও ঘোড়া থেকে মাটিতে ছিটকে পড়ে। সে প্রাণপণ চেষ্টা করেও ঘোড়াটিকে বের করতে ব্যর্থ হয়। অবশেষে বাধ্য হয়ে নবিজির কাছে সাহায্য চাইলে নবিজি থেমে যান

এবং তাঁর বরকতে ঘোড়াটি মাটির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে সুরাকা তার সব পাথেয় নবিজির খিদমতে পেশ করে। নবিজি এসব প্রত্যাখ্যান করে বলেন, 'যেহেতু তুমি ইসলাম গ্রহণ করোনি, তাই আমি তোমার কিছু নিতে পারি না। তবে তুমি আমাদের অবস্থান সম্পর্কে কাউকে কিছু বলবে না। ব্যস, এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট।'

সুরাকা সেখান থেকে ফিরে আসে এবং যে পর্যন্ত নবিজির ক্ষতির আশঙ্কা ছিল, ততক্ষণ সে কারও কাছে এ ঘটনা বলেনি।

## উম্মু মাবাদ ও তার স্বামীর ইসলাম গ্রহণ:

মদিনার পথে নবিজি ﷺ উম্মু মাবাদ বিনতু খালিদ নামের এক মহিলার বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তার যে বকরিগুলো ইতিপূর্বে দুধখরায় ভুগছিল, নবিজি সেগুলোর স্তনে হাত বুলিয়ে দিলে তা দুধে ভরে ওঠে। পরে তা থেকে তিনি নিজেও পান করেন এবং তাঁর সঙ্গীদেরও পান করান। আর এই বরকত এভাবেই অব্যাহত থাকে। উম্মু মাবাদের বাড়ি থেকে নবিজি ﷺ চলে যাওয়ার পর তাঁর স্বামী বাড়ি ফিরে বকরির দুধ- সম্পর্কিত আশ্চর্য ঘটনা দেখে বিস্মিত হন। কারণ জিজ্ঞেস করলে উম্মু মাবাদ বলেন, 'আজ আমাদের বাড়িতে অত্যন্ত ভদ্র ও সম্মানিত এক যুবক কিছুক্ষণের জন্য মেহমান হয়েছিলেন। এসব তাঁরই পবিত্র হাতের বরকত।' এ কথা শুনে তাঁর স্বামী বলেন, 'আল্লাহর শপথ, আমার তো মনে হচ্ছে তিনি মক্কার সেই মহান পুরুষই হবেন।' এক বর্ণনায় রয়েছে, এরপর এই বেদুইন দম্পতিও হিজরত করে মদিনায় চলে যান এবং ইসলামগ্রহণ করেন।

## কুবায় অবতরণ:

এখান থেকে রওনা হয়ে নবিজি ﷺ কুবায় পৌঁছান। আনসাররা যখন থেকে নবিজির ﷺ আগমনের সংবাদ পেয়েছিলেন, তখন থেকেই তাঁরা তাঁকে সংবর্ধনা জানাতে প্রতিদিন নিজেদের মহল্লা থেকে বেরিয়ে আসতেন। সেদিনও তাঁরা যথারীতি অপেক্ষা করে ফিরে যাচ্ছিলেন। তখন হঠাৎ একটি আওয়াজ শোনা যায়- 'এতদিন তোমরা যাঁর অপেক্ষা করছিলে, তিনি চলে এসেছেন!'

নবিজিকে ﷺ আসতে দেখে সবাই বিপুল উদ্দীপনায় সংবর্ধনার সঙ্গে তাঁকে বরণ করেন। কুবায় নবিজি ﷺ ও তাঁর সাথিরা ১৪ দিন অবস্থান করেন। এ সময়ে তিনি কুবায় একটি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। এটিই ইসলামের প্রথম মসজিদ।

## আলি (রা.) হিজরত ও কুবায় সাক্ষাৎ:

নবিজির ﷺ আমানতদারিতা যেহেতু কাফিরদের কাছেও স্বীকৃত ছিল, তাই তাঁর কাছে অধিকাংশ মানুষের কিছু-না কিছু আমানত গচ্ছিত থাকত। হিজরতের সময় এ কারণে তিনি আলি রা.-কে মক্কায় রেখে এসেছিলেন যে, তিনি যেন সেই গচ্ছিত আমানতসমূহ নিজ নিজ মালিকের হাতে পৌঁছে দেন। নবিজির ﷺ নির্দেশমতো আলি রা. সব আমানত তাদের মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়ার পর তিনিও মদিনার উদ্দেশে রওনা করেন এবং কুবায় নবিজির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

## হিজরিবর্ষের সূচনা:

এ সময় নবিজির ﷺ নির্দেশে উমর রা. হিজরিবর্ষ বা ইসলামি সনের সূচনা করেন এবং মুহাররামকে ইসলামি বর্ষপঞ্জিকার প্রথম মাস নির্ধারণ করেন।

## মদিনায় প্রবেশ:

রবিউল আউয়ালের শুক্রবার দিন নবিজি ﷺ কুবা থেকে বিদায় নিয়ে মদিনার দিকে রওনা দেন। মদিনার আনসাররা তখন আনন্দের আতিশয্যে নবিজির ﷺ বাহন ঘিরে সামনে এগোচ্ছিলেন। কেউ পায়ে হেঁটে, কেউ-বা বাহনে আরোহী হয়ে। সবাই তখন নবিজির ﷺ উটের লাগাম ধরতে চেষ্টা করেন। তাঁদের সবারই আন্তরিক চাওয়া ছিল, তিনি যেন তাঁর ঘরের মেহমান হন এবং কিছুদিন অবস্থান করেন। মহিলা ও শিশুদের আনন্দ সে দিন দেখে কে! শিশু-কিশোররা তখন আনন্দে গান গাইছিল।

সে দিন ছিল শুক্রবার। তাই নবিজি ﷺ যখন বনু সালিম ইবনু আউফের মহল্লায় পৌঁছান, তখন জুমুআর সময় হয়ে যায়। ফলে তিনি সেখানেই জুমুআ আদায় করে পুনরায় বাহনে সওয়ার হন।

তখন পথিমধ্যে যে আনসার সাহাবির বাড়ি সামনে পড়ত, তিনিই নবিজির ﷺ কাছে আবেদন করেন, 'আমার দরিদ্র এ ঘরে তাশরিফ রাখুন।' তিনি তাঁদের বলেন, 'তোমরা উটনীকে তার নিজের মতো করে চলতে দাও। সে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশপ্রাপ্ত। তাকে যেখানে থামার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে সে নিজেই থেমে যাবে।' ফলে সেটি তার মতো করে চলতে লাগল। একপর্যায়ে নবিজির ﷺ মামার বংশ আদি ইবনু নাজ্জার গোত্রের মহল্লায় আবু আইয়ুব

আনসারি রা.-এর বাড়ির সামনে গিয়ে উটনীটি বসে পড়ে। সৌভাগ্যের সিতারা হয়ে আবু আইয়ুবের মেহমান হন নবিজি ﷺ এবং বেশ কয়েকদিন তাঁর বাড়িতে থাকেন।

## মসজিদে নববি নির্মাণ:

তখন পর্যন্ত মদিনায় কোনো মসজিদ ছিল না, তাই যেখানে সুযোগ হতো, সেখানেই নামাজ পড়া হতো। নবিজি ﷺ মদিনায় আসার পর উটনীটি প্রথমে যে জায়গায় থেমেছিল, সে জায়গাটি কিনে সেখানেই মসজিদে নববি নির্মাণ করেন।

মসজিদে নববির দেয়াল ছিল প্রথমে কাঁচা ইটের, খুঁটি ছিল খেজুরগাছ আর ছাদ খেজুরের ডাল দিয়ে তৈরি। মসজিদের কিবলা ছিল বায়তুল মাকদিসের দিকে। কেননা, তখন পর্যন্ত মুসলিমদের কিবলা ছিল বায়তুল মাকদিস। মসজিদের সঙ্গে দুটি কক্ষও তৈরি করা হয়-একটি আয়েশা রা.আর অন্যটি সাওদা রা.-এর জন্য। এরপর নবিজি ﷺ একজনকে মক্কায় পাঠিয়ে তাঁর পরিবারের লোকদের মদিনায় নিয়ে আসেন। এ সময় আবু বকর রা.-ও তাঁর পরিবারের সকল সদস্যকে মদিনায় নিয়ে আসেন। ফলে উম্মুল মুমিনিন সাওদা রা. এবং নবিজির দুই মেয়ে ফাতিমা ও উম্মু কুলসুম রা.-ও মদিনায় চলে আসেন। এ ছাড়া অপর মেয়ে জায়নাব রা.-কে তাঁর স্বামী আবুল আস মদিনায় আসতে দেননি, যেহেতু আবুল আস তখনো মুসলমান হননি। অপরদিকে আবু বকরের পুত্র আবদুল্লাহ রা. তাঁর মা ও দুই বোন আয়েশা ও আসমাকে নিয়ে মদিনায় চলে আসেন।

এ পর্যায়ে কতিপয় অক্ষম ও দুর্বল মুসলমান মক্কায় রয়ে যান, যাদের সফর করে মদিনায় আসার মতো শারীরিক শক্তি ছিল না। তবে তাঁদের কেউ কেউ মদিনার উদ্দেশে বের হয়েছিলেন; কিন্তু পথিমধ্যে ইনতিকাল করেন।

## ক্বিবলার পরিবর্তন:

রাসূলুল্লাহর ﷺ মদীনায় হিজরতের ১৪ মাস পরে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা ঘটে। তা হলো ক্বিবলার পরিবর্তন। মক্কাতে থাকাকালীন সময়ে ক্বিবলা ছিল জেরুসালেম বরাবর; কিন্তু তখন কিবলা নিয়ে কোনো সমস্যা হয়নি, কারণ মক্কায় থাকাকালীন তিনি জেরুসালেম ও কাবা উভয়কে সামনে রেখে সালাত আদায় করতেন। এভাবে তিনি জেরুসালেম ও কাবা উভয়ের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করতে পারতেন। কিন্তু মদীনায় হিজরতের পর দেখা গেল যে, সেখান থেকে মক্কা ও জেরুসালেমের অবস্থান পরস্পরের বিপরীত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কাবা বরাবর সালাত আদায় করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি আল্লাহকে জিজ্ঞেস করার সাহস পাননি। এরপর

আল্লাহ আযযা ওয়াজাল ইবরাহীমের ক্বিবলা অর্থাৎ কাবাকে মুসলিমদের ক্বিবলা বানানোর নির্দেশ দিয়ে আয়াত নাযিল করলেন। এ আয়াতটি মদীনাতে অবতীর্ণ হয়েছিল। এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ নতুন কিবলা বরাবর সালাত আদায় করলেন। এরই মধ্যে একজন সাহাবী রা.মদীনার কয়েক মাইল দূরে তাঁর গোত্রকে কিবলা পরিবর্তনের খবরটি জানানোর জন্য বের হয়ে পড়েন। তিনি গিয়ে দেখলেন যে তাঁরা পুরনো কিবলা অর্থাৎ জেরুসালেম বরাবর আসরের সালাত পড়ছে। ওই অবস্থাতেই সেই সাহাবী রা. তাদেরকে বললেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আমি মাত্রই রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে মক্কা বরাবর সালাত আদায় করেছি।' এ কথা শুনে তাঁরা তৎক্ষণাৎ সালাতের মধ্যেই নিজেদের ক্বিবলা মক্কার দিকে পরিবর্তন করে ফেললো। এ ঘটনা থেকে রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রতি সাহাবিদের প্রবল আনুগত্য যেমন বোঝা যায়, তেমনি বোঝা যায় সেই সমাজে একজন মুসলিমের কথার উপর সবাই কতটা আস্থা রাখত।

## ইসলামে জিহাদের সূচনা

মাদানী যুগ মানেই জিহাদের যুগ। মাদানী যুগ ছিল ১০ বছর স্থায়ী আর এই অল্প সময়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজে ১৯ টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং ৫৫ টির বেশি সামরিক অভিযান পাঠিয়েছেন। অর্থাৎ এই ১০ বছরে ৭০ টিরও বেশি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

জিহাদ শব্দের আক্ষরিক অর্থ ‘প্রচেষ্টা’, এর মানে হলো ‘সংগ্রাম বা চেষ্টা করা’। ইসলামি পরিভাষায় শব্দটির অর্থ হলো যারা আল্লাহর দ্বীনের বিরুদ্ধাচারণ করে অর্থাৎ যারা আল্লাহর শত্রু তাদের বিরুদ্ধে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করতে যুদ্ধ করা।

জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষকে অন্য সব কিছুর দাসত্ব থেকে মুক্ত করে শুধুমাত্র আল্লাহ তাআলার দাসে পরিণত করা। সুতরাং সৃষ্টির দাস না হয়ে বরং মানুষ সৃষ্টিকর্তার দাস হবে এটাই মানুষের জন্য সাজে, কেননা, মানুষ হলো সৃষ্টির সেরা এবং সৃষ্টির সেরা হয়ে সে আরেক সৃষ্টির ইবাদাত করতে পারে না। জিহাদের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো মুসলিম-অমুসলিম সকলকে ইসলামের কল্যাণময় শাসনের ছায়াতলে নিয়ে আসা। ইসলামে কাউকে মুসলিম হওয়ার জন্য বাধ্য করা হয় না, তবে ইসলামি ব্যবস্থার মধ্যে থাকতে বাধ্য করা হয় যাতে করে মানুষ ইসলামের সৌন্দর্য বুঝতে পারে এবং ইসলাম গ্রহণে উৎসাহী হয়।

## মুজাহিদ বাহিনী গঠন:

রাসূলুল্লাহ ﷺ যে বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন তাকে ঠিক প্রচলিত অর্থে সেনাবাহিনী বলা যায় না। কারণ তাঁরা পেশাদার সৈনিক ছিলেন না। বরং তাদেরকে বলা চলে মিলিশিয়া বা বেসামরিক যোদ্ধা- তাদের সামরিক প্রশিক্ষণ ছিল কিন্তু তাঁরা নিয়মিত সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য সবাইকে পাঁচটি শর্ত পূরণ করতে হতো। শর্তগুলো হলো:

১) ইসলাম

২) বয়ঃপ্রাপ্ত হতে হবে

৩) মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে হবে

৪) এমন কোনো শারীরিক ত্রুটি না থাকা যা থাকলে যুদ্ধে অংশ নেওয়া সম্ভব হবে না।

৫) আর্থিক সামর্থ্য থাকা, এই ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ প্রত্যেক যোদ্ধার খরচ বহন করার মতো সামর্থ্য রাসূলুল্লাহর ﷺ ছিল না। প্রত্যেককে নিজের খরচ নিজেকেই বহন করতে হতো।

একই সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বাহিনীকে আধ্যাত্মিকভাবে প্রস্তুত করছিলেন। কুরআনে জিহাদ বিষয়ক অসংখ্য আয়াত আছে যা একজন মুসলিমকে জিহাদের ময়দানের জন্য আত্মিকভাবে প্রস্তুত হতে সাহায্য করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। সাহাবীরা শারিরীকভাবে শক্তসমর্থ ছিলেন, তাঁরা যে ধরনের কাজ করতেন তাতে তাদের যথেষ্ট শারিরীক দক্ষতা ছিল। তবে কিছু ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা ছিল না। যেমন, মক্কা ও মদিনার আশেপাশে কোনো সমুদ্র ছিল না, তাই তাঁরা সাঁতার জানতেন না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে সাঁতার শেখার নির্দেশ দেন। তিনি তাদেরকে তীর চালনা, লক্ষ্যভেদ ইত্যাদি নানারকম সামরিক দক্ষতায় দক্ষ করে তুলেছিলেন।

## সামরিক অভিযান শুরু: গাজওয়া ও সারিয়া

আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে জিহাদের অনুমতি পাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঠানো শুরু করলেন 'সারিয়া'। যুদ্ধ দু'ধরনের, একটি হলো সারিয়া ও অপরটি হলো গাযওয়া। বদর বা উহুদের যুদ্ধকে বলা হয় গাযওয়ায়ে বদর বা গাযওয়ায়ে উহুদ; অন্যদিকে আবু উবাইদাহর নেতৃত্বে সামরিক অভিযানকে বলা হয়েছে সারিয়ায়ে আবু উবাইদাহ। যেসব অভিযানে রাসূলুল্লাহ ﷺ অংশগ্রহণ করেননি সেগুলোকে সারিয়া বলা হয় আর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে যেসব অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন সেগুলোকে বলা হয় গাযওয়া।

রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রথম যে গাযওয়া অংশ নিয়েছিলেন সেটি হলো গাযওয়ায়ে উল আবওয়া। এই গাযওয়াতে কোনো যুদ্ধ হয়নি। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ উবাইদাহ ইবন আবওয়ার রা. নেতৃত্বে সারিয়া পাঠান। এ দলে ৬০ জন মুহাজির ছিলেন। তাঁরা সবাই পায়ে হেঁটে এ অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা রাতে হাঁটতেন আর দিনে লুকিয়ে থাকতেন। এ অভিযানে তীর ছোঁড়াছুড়ি হয়েছিল কিন্তু কেউ মারা যায়নি। ইসলামের আবির্ভাবের পর মুসলিমদের পক্ষ থেকে সর্বপ্রথম যিনি তীর ছুঁড়েছিলেন তিনি হলেন সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস। তিনি বলেছেন, 'আমিই সেই জন যে আল্লাহর রাস্তায় প্রথম তীর নিক্ষেপ করি।'

এরপর হামযা ইবন আবদুল মুত্তালিবের নেতৃত্বে আরেকটি সারিয়া পাঠানো হয়। এ অভিযানে ৩০ জন মুহাজিরকে পাঠানো হয়। এবার তাঁরা উটে চড়ে অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা কুরাইশদের একটি কাফেলা আক্রমণ করার জন্য গিয়েছিলেন। এ কাফেলাতে কুরাইশদের প্রচুর সম্পদ ছিল এবং এর সাথে অনেক রক্ষক ছিল। শেষপর্যন্ত এ অভিযানেও কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি, কেননা সে এলাকায় এক গোত্রনেতার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং কুরাইশদের চুক্তি ছিল। কোনো ধরনের মারামারি যাতে না হয় সে ব্যাপারে তিনি লক্ষ্য রেখেছিলেন। এ ঘটনার পর আবু জাহেল তার লোকদের কাছে গিয়ে সতর্ক করে বললো যে, মুহাম্মাদ 'ক্রুদ্ধ সিংহের' ন্যায় তাদের পেছনে লেগেছে, কেননা তাঁকে ও তাঁর সঙ্গীদের মক্কা থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। আবু জাহেল তার লোকদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়ে বললো যে, মুহাম্মাদ তাদের কাফেলা ও তাদের উপর আক্রমণ করার জন্য অপেক্ষা করছে।

আরো একটি গাযওয়া সংঘটিত হয়েছিল যার নাম গাযওয়ায়ে বুয়াত। কুরাইশদের একটি কাফেলা দখল করার জন্য এই অভিযান পরিচালিত হয় কিন্তু কাফেলাটি পাওয়া যায়নি।

গাযওয়াত আল আশিরাতেও একটি কাফেলা আটক করার জন্য সেনাদল পাঠানো হয় কিন্তু সেটিও পাওয়া যায়নি। এরপরে ঘটে সারিয়ায়ে সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস এবং গাযওয়ায়ে বদর উলা। হিজরতের প্রথম দুই বছরের মধ্যেই অভিযানগুলো পরিচালিত হয়।

## সারিয়ায়ে নাখলা:

রাসূল ﷺ রজবের শেষের দিকে কুরাইশদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য আবদুল্লাহ ইবনু জাহশ আসাদির নেতৃত্বে আট জন মুহাজিরকে দক্ষিণ মক্কার নাখলা উপত্যকার দিকে পাঠান। এঁরা শুধু সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গেলেও পথে কুরাইশদের এক বণিকদলের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়। তাঁরা বণিকদলের সরদার আমর ইবনু হাজরামিকে হত্যা করে কাফেলার জিনিসপত্র দখল করে নেন। ফিরে আসার পথে উসমান ইবনু আবদিল্লাহ এবং হাকাম ইবনু কায়সান নামের দুই ব্যক্তিকে বন্দি করে মদিনায় নিয়ে আসেন। মদিনা পৌঁছে তাঁরা গনিমতে প্রাপ্ত সম্পদ রাসূলের ﷺ
দরবারে পেশ করলে তিনি সেগুলোর দিকে চোখ তুলেও তাকাননি। শেষপর্যন্ত এ ব্যাপারে আয়াত অবতীর্ণ হয়,

*সম্মানিত মাস সম্পর্কে তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে যে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন? বলে দাও এতে যুদ্ধ করা ভীষণ বড় পাপ। আর আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং কুফরি করা, মসজিদে হারামের পথে বাধা দেওয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদের বহিষ্কার করা আল্লাহর কাছে তার চেয়েও বড় পাপ। আর ধর্মের ব্যাপারে ফিতনা সৃষ্টি করা নরহত্যা থেকেও মহাপাপ। বস্তুত তারা তো সর্বদাই তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকবে, যাতে দীন থেকে তোমাদের ফিরিয়ে দিতে পারে- যদি সম্ভব হয়। তোমাদের মধ্যে যে নিজের দীন থেকে ফিরে যায় এবং কাফির অবস্থায় মারা যায়, দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের যাবতীয় আমল বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারাই হলো জাহান্নামী। সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। [সুরা বাকারা: ২১৭]*

## বদর যুদ্ধের প্রেক্ষাপট

বদর যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে প্রথম সম্মুখযুদ্ধ, যা ২ হিজরির ১৭ রমজান শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয়। মদিনা থেকে প্রায় ৮০ মাইল দূরে বদর নামক কূপের কাছে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যেখানে পানির প্রাচুর্য ছিল এবং তা স্থানটির কৌশলগত গুরুত্ব বাড়িয়ে তোলে। মক্কার কাফিররা ইসলামের বিস্তার এবং মুসলিমদের সাফল্য দেখে চিন্তিত ছিল, কারণ এটি তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের জন্য হুমকি ছিল।

## মক্কার কাফেলার পরিকল্পনা:

মদিনায় বইতে থাকা ইসলামের আলো মক্কার কাফিরদের জন্য বিপদের কারণ হয়ে উঠছিল। তারা চিন্তা করছিল, কিভাবে মুসলিমদের শক্তি নষ্ট করা যায়। মক্কার কাফিরদের গর্ব, অহংকার এবং শক্তির উৎস ছিল শামে তাদের বাণিজ্য। মুসলিমদের জন্য এটি বড় সমস্যা ছিল, কারণ মক্কার কাফিরদের শক্তির উৎস বন্ধ করা মুসলিমদের রাজনীতি ও কৌশল ছিল।

এ সময়ে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মক্কার বাণিজ্যকাফেলা শামে যাচ্ছিল। নবী ﷺ এর এই বিষয়টি জানতে পেরে ৩১৪ জন সাহাবির সঙ্গে কাফেলার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য বের হন। রাওহা নামক স্থানে পৌঁছানোর পর, তারা একটি শিবির স্থাপন করেন। তবে, আবু সুফিয়ান বিষয়টি বুঝতে পেরে সমুদ্রের উপকূল ধরে তার কাফেলা নিয়ে চলে যান। একই সময়ে, মক্কা থেকে ৯৫০ জন সশস্ত্র যোদ্ধা মদিনার দিকে রওনা হয়।

## সাহাবীদের আত্মত্যাগ:

নবী ﷺ মুসলিম বাহিনীর প্রস্তুতির জন্য সাহাবিদের সাথে পরামর্শ করেন। সাহাবিরা নিজেদের জান-মাল সঁপে দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। আবু বকর রা., মিকদাদ রা., এবং সাআদ ইবনু উবাদা রা. যুদ্ধের জন্য নিজের আত্মত্যাগের দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেন। এমনকি, যুবক উমায়ের ইবনু ওয়াক্কাসও যুদ্ধের অংশগ্রহণের জন্য কান্না করতে থাকেন, যার ফলে নবী ﷺ তাকে অনুমতি দেন।

## যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং কৌশল:

মুসলিম বাহিনী বদর প্রান্তরে পৌঁছানোর পর জানতে পারে, আবু সুফিয়ানের কাফেলা নিরাপদে চলে গেছে, কিন্তু কুরাইশদের বিশাল বাহিনী সেখানে অবস্থান করছে। কুরাইশরা ময়দানের এমন জায়গায় শিবির স্থাপন করেছে, যেখানে পানির উৎস ছিল এবং মুসলিম বাহিনী শুষ্ক, বালুকাময় স্থানে অবস্থান নিয়েছিল, যেখানে পানি ছিল না।

এদিকে, নবী ﷺ মুসলিম বাহিনীর কাতার ঠিক করতে নিজেই দাঁড়িয়ে যান। ফলে মুসলিম বাহিনী এক সুদৃঢ় প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে যায়।

## গায়েবি সাহায্য:

আল্লাহ তাআলা মুসলিম বাহিনীর জন্য বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং তিনি সেভাবেই সবকিছু ব্যবস্থা করেন। যুদ্ধের আগের দিন বৃষ্টি হয়, যার ফলে বালু জমে শক্ত হয়ে যায় এবং মুসলিমরা তৃপ্তিভরে পানি পান করে প্রস্তুতি নেন। অন্যদিকে, কুরাইশ বাহিনীর অবস্থান পিচ্ছিল হয়ে যায়, যার ফলে তাদের চলাফেরা কঠিন হয়ে ওঠে। এভাবে, বদর যুদ্ধের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মুসলিম বাহিনীর সাহায্য পাঠান এবং ইসলামের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ বিজয়ের সূচনা হয়।

## দ্বন্দ্বযুদ্ধের শুরু:

যুদ্ধের শুরুতে, কুরাইশ বাহিনী থেকে তিনজন বীর-উতবাই, ইবনু রাবিআ, ও ওয়ালিদ ইবনু উতবা যুদ্ধে অংশ নিতে সামনে আসে। মুসলিম বাহিনী থেকে হামজা ইবনু আবদুল মুত্তালিব রা., উবায়দা ইবনু হারিস রা. এবং আলি ইবনু আবি তালিব রা. তাদের মোকাবিলা করেন। দ্বন্দ্বযুদ্ধে কুরাইশের তিনজন যোদ্ধা নিহত হয়, কিন্তু মুসলিম বাহিনীর পক্ষ থেকে উবায়দা রা. আহত হন।

আলি রা. উবায়দাকে নবীর কাছে নিয়ে আসেন, যেখানে নবী ﷺ তার চেহারা থেকে ধুলো পরিষ্কার করেন। উবায়দা রা. শাহাদাতের মুহূর্তে নবী ﷺ থেকে জানতে চান, "আল্লাহর রাসুল ﷺ, আমি কি শহিদ হতে পারলাম?" নবী ﷺ তাকে উত্তরে বলেন, "হ্যাঁ, তুমি শহিদ এবং আমি এর সাক্ষী।" নবী ﷺ এর কথা শুনে উবায়দা রা. অত্যন্ত আনন্দিত হন।

## সাহাবিদের বিস্ময়কর আত্মত্যাগ:

বদরের ময়দানে যখন কাফির ও মুসলিম বাহিনী একে অপরের মুখোমুখি হয়, তখন এমন পরিস্থিতি দেখা যায়, যেখানে মুসলিমদের আত্মীয়স্বজন ও প্রিয়জনও কাফির বাহিনীতে ছিলেন। তবুও আল্লাহর বাহিনীর সদস্যরা তাদের আত্মীয়-পরিজনকে দূরে সরিয়ে রেখে আল্লাহর জন্য লড়াইয়ে অবিচল থাকেন। এসময় আবু তালিবের পঙক্তির মতো সাহাবিরা দৃঢ় সংকল্পে বলেছিলেন যে, "তাদের কেউ আল্লাহর পথে আমাদের সঙ্গে লড়াই না করে আমাদের ত্যাগ করবে না, যতক্ষণ না আমরা আল্লাহর জন্য নিজেদের সঁপে দিই।"

এক সময়, আবু বকর সিদ্দিক রা. এর ছেলে, যিনি তখনো মুসলমান হননি, যুদ্ধের মাঠে আসেন। তখন আবু বকর রা. নিজে তার দিকে তরবারি নিয়ে এগিয়ে যান। একইভাবে, উতবা

যখন তার ছেলে হুজায়ফা রা. কে সামনে পেয়ে তাকে পিতার দিকে তরবারি দিয়ে এগিয়ে যেতে দেখেন। উমরের রা. নিজের মামার সঙ্গে যুদ্ধে মোকাবিলা করেন।

## রাসুল ﷺ এর দুআ এবং আল্লাহর সাহায্য:

যুদ্ধের তীব্রতার মধ্যে রাসুল ﷺ সিজদায় পড়েন এবং আল্লাহর কাছে সাহায্যের জন্য দুআ করতে থাকেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর সাহায্যের ঘোষণা দেন এবং নবী ﷺ আশ্বস্ত হন। মুসলিম বাহিনী আল্লাহর সাহায্যে জয়ী হয় এবং বদর যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক বিজয়ের মুহূর্ত হয়ে ওঠে।

## আবু জাহলকে হত্যা:

আবু জাহলের অপকর্ম এবং ইসলামের বিরুদ্ধে তার শত্রুতা সম্পর্কে সবাই জানতেন, ফলে আনসারদের মধ্যে কিশোর মুআজ ইবন আমর ইবন জামুহ ও মুআজ ইবন আফরা নামের দুই ভাই প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তাঁরা যখনই তাকে দেখবেন, তখনই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করবেন অথবা নিজেরা শহিদ হয়ে যাবেন।

বদরের যুদ্ধকে সুযোগ মনে করে নিজেদের প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে দুই ভাই বের হন; কিন্তু তাঁরা আবু জাহলকে কখনো দেখেননি, তাই তাকে চিনতেন না। তাঁরা আবদুর রাহমান ইবনু আউফকে জিজ্ঞেস করেন, 'আবু জাহল লোকটা কে?' আবদুর রাহমান ইবনু আউফ রা. তখন ইশারায় তাকে দেখিয়ে দেন। আবু জাহলকে দেখামাত্রই তাঁরা বাজপাখির মতো তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। মুহূর্তের মধ্যেই কাফির সরদার আবু জাহল মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

এ সময় আবু জাহলের পাশেই যুদ্ধ করছিলেন তার ছেলে ইকরিমা। তিনি পরে মুসলমান হয়েছিলেন। তিনি পিতার এই করুণ দশা দেখে প্রথমে ভড়কে যান। এরপর পেছন দিক থেকে এসে মুআজ রা.-এর বাহুতে তরবারি দিয়ে সজোরে আঘাত করেন। ফলে তাঁর হাতটি কেটে যায় এবং শরীর থেকে আলাদা হয়ে চামড়ার সামান্য অংশে ঝুলে থাকে। এ অবস্থায়ই তিনি ইকরিমার পিছু ধাওয়া করেন; কিন্তু ইকরিমা দৌড়ে পালিয়ে যান।

মুআজ রা.-এর কর্তিত হাতটি তখনো ঝুলে ছিল এবং এতে তাঁর বেশ কষ্ট হচ্ছিল, এ জন্য তিনি সে হাতটি পায়ের নিচে রেখে এক টানে ছিড়ে ফেলেন। তারপর ছিড়ে ফেলা হাত দূরে নিক্ষেপ করে আবারও যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়েন।

রাসুল সাঃ সাহাবাদের জিজ্ঞেস করলেন, ‘কে আছে আমাকে আবু জাহেলের শেষ পরিণতির কথা জানাবে?’ আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. বলেন, ‘আমি আবু জাহেলকে খুজতে গেলাম। দেখলাম মাটিতে এক লোক পড়ে আছে। ভালো করে তাকিয়ে দেখি এটাই আবু জাহেল। আমি তার গলায় পা রাখলাম। মক্কায় সে একবার আমাকে বন্দী করে লাথি মেরেছিল।' আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আল্লাহর দুশমন! দেখলি তো শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তোকে কীভাবে অপমানিত করলেন?' আবু জাহেল বললো, 'আল্লাহ আমাকে অপমানিত করেছেন? আরে, যাকে হত্যা করলি তার চেয়ে অভিজাত আর কেউ কি আছে? বল আমাকে আজ, কারা জয়ী হয়েছে?' আবু জাহেল তার শেষ মুহূর্তে এসেও যুদ্ধের ফলাফল জানতে চেয়েছিল।

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. বলেন, ‘আমার কাছে তরবারি ছিল, আমি নির্দ্বিধায় তাকে হত্যা করতে এগিয়ে যাই। আমি দেখতে পাই তার ধারালো তরবারিটা তার হাতে মুষ্টিবদ্ধ। আমি তার হাতে আক্রমণ করলে তরবারিটা হাত থেকে পরে যায়। তারপর আমি তার তরবারিটা হাতে নিয়ে তার শিরশ্ছেদ করি। কর্তিত মুণ্ডু নিয়ে রাসূলের সামনে উপস্থিত হই। এটা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ খুশিতে আত্মহারা হলেন, ‘সত্যি!' ইবনে মাসউদ রা.বললেন, 'হ্যাঁ আল্লাহর রাসূল!’ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তোকে অপমানিত করেছেন, তুই আল্লাহর শত্রু। প্রত্যেক উম্মতের একজন ফিরআউন আছে, আর এ হচ্ছে এই উম্মতের ফিরআউন।’

## ফেরেশতাদের সাহায্য ও শত্রুদের পরাজিত করা:

আল্লাহ তাআলার আদেশে রাসুল ﷺ একমুঠো মাটি বা পাথর নিয়ে শত্রুদের প্রতি ছুড়ে মারেন এবং সাহাবিদের নির্দেশ দেন, 'একযোগে তোমরা তাদের ওপর হামলা চালাও।' এদিকে রাসুলের ﷺ নিক্ষিপ্ত পাথর তাদের সবার চোখে বিদ্ধ হয়। নবিজির ﷺ নির্দেশ পেয়েই সাহাবিদের ছোট এই বাহিনী কাফিরদের দিকে এগিয়ে যায়। অন্যদিকে আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের সাহায্যের জন্য ফেরেশতাদের পাঠিয়ে দেন। এভাবেই আল্লাহ তাঁর সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পূরণ করেন।

এ যুদ্ধে কুরাইশদের বড় বড় অনেক নেতা নিহত হয়। এতে করে মুশরিক সেনাদের মনোবল ভেঙে যায় এবং পরাজিত হয়ে তারা যুদ্ধের মাঠ থেকে পালায়। মুসলিমরা তখন শত্রুবাহিনীর পিছু ধাওয়া করে অনেককে হত্যা এবং অনেককে বন্দি করেন। এভাবে কাফিরদের ৭০ জন নিহত ও ৭০ জন বন্দি হয়। নিহতের মধ্যে কুরাইশের নেতা আবু জাহল, উমাইয়া ইবন খালফ, শায়বা ইবন রাবিআ, তার ভাই উতবা এবং তার ছেলে ওয়ালিদ ইবন উতবা গং ছিল।

অপরদিকে মুসলিমদের মধ্যে মাত্র ১৪ জন শহিদ হন। তাঁদের মধ্যে ছয়জন মুহাজির ও আটজন আনসার সাহাবি ছিলেন।

## যুদ্ধবন্দি:

৭০ জন বন্দীদের মধ্যে থেকে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ আলাদা করে দুই ব্যক্তিকে বেছে নিলেন। তারা হলেন উকবা ইবন আবি মুয়াইত এবং নযর ইবন হারিস। রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নির্দেশে আসিম ইবন সাবিত রা. উকবার শিরশ্ছেদ করে এবং নযর ইবন হারিসকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন আলী ইবন আবি তালিব। এই দুইজন লোক ছিল আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্য, অবাধ্য, খারাপ, হিংসুটে এবং কট্টর কাফের।

সকল যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে কেবল এই দুইজনকে হত্যা করা হয় আর বাকিদের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ ﷺ সাহাবাদের রা. বিশেষভাবে নির্দেশ দেন, ‘যুদ্ধবন্দীদের সাথে সদয় আচরণ করো।’ ফলে সাহাবীরা তাদের ভালী খাবার খাওয়াতেন, আরামে রাখতেন আর নিজেরা শুধু খেজুর খেয়ে দিন পার করতেন।

মুসআব ইবনে উমায়ের রা.-এর ভাই আবু আযীযও যুদ্ধবন্দী ছিলেন। তিনি বলেন, ‘আমাকে যে আনসার সাহাবীর দায়িত্বে দেওয়া হয়েছিল, তিনি যখন খাবার নিয়ে আসতেন, তখন আমার সামনে রুটি রেখে দিতেন এবং তিনি শুধু খেজুর খেয়ে দিন পার করতেন।’

যুদ্ধবন্দিদের মধ্যে নবিজির ﷺ সম্মানিত চাচা আব্বাসও ছিলেন। তিনি পরবর্তী সময়ে মুসলমান হন। আব্বাস রা. রাত হলে তাঁর এই বন্দিদশার কারণে কষ্ট পাচ্ছিলেন। তাঁর এই যন্ত্রণাকাতর আওয়াজ নবিজির কানে পৌঁছতেই তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। সকাল হলে সাহাবিরা জিজ্ঞেস করেন, 'আল্লাহর রাসুল, আপনি রাতে ঘুমাননি কেন?' নবিজি ﷺ বলেন, 'আমি কীভাবে ঘুমাই; অথচ আমার সম্মানিত চাচার কষ্টের আওয়াজ আমার কানে আসছে? '

অন্যান্য বন্দিদের কাছ থেকে যে পরিমাণ মুক্তিপণ আদায় করা হয়েছে, তাঁর থেকেও তা-ই আদায় করা হয়েছে; বরং সাধারণ বন্দিদের থেকে একটু বেশিই নেওয়া হয়েছে তাঁর কাছ থেকে। আব্বাস রা. ছিলেন ধনিকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত, তিনি ২০ উকিয়া স্বর্ণ প্ররিশোধ করেছিল। এরপরই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

ঠিক এভাবেই নবিজির ﷺ জামাতা আবুল আসও যুদ্ধবন্দি ছিলেন। তাঁর কাছে মুক্তিপণ দেওয়ার মতো কিছু ছিল না। তখন তাঁর স্ত্রী অর্থাৎ, নবিকন্যা জায়নাবের কাছে তিনি সংবাদ পাঠান,

তিনি যেন মুক্তিপণের অর্থ পাঠিয়ে দেন। কেননা, তিনি তখন মক্কায় ছিলেন। জায়নাব রা.-এর গলায় একটি হার ছিল। এটি তাঁর মা খাদিজা রা. তাঁর বিয়ের সময় উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন। জায়নাব গলা থেকে সেটি খুলে মদিনায় পাঠিয়ে দেন। নবিজির সামনে যখন হারটি উপস্থাপন করা হয়, তখন তিনি সেটি দেখে খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। তিনি সাহাবিদের রা. বলেন, 'এটি জায়নাবের মায়ের স্মৃতিচিহ্ন। যদি তোমরা সম্মত হও, তাহলে হারটি তাঁর কাছে ফেরত পাঠিয়ে দাও।' সাহাবিরা রা. নবিজির ﷺ এই প্রস্তাব খুশিমনে মেনে নেন। এরপর রাসুল আবুল আসকে এই শর্তে ছেড়ে দেন যে, তিনি জায়নাবকে মদিনায় পাঠিয়ে দেবেন আর কখনোই মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোনো শত্রুদের সাহায্য করবেন না। আবুল আস তার কথা রেখেছিল। সে মক্কায় ফিরে গিয়ে জায়নাবকে মক্কা ছেড়ে তাঁর বাবার কাছে চলে যাওয়ার অনুমতি দেয়।

## আবুল আসের ইসলাম গ্রহণ:

নবিজির ﷺ জামাতা আবুল আস মুক্তিলাভের পর মক্কা ফিরে গিয়েই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী স্ত্রী জায়নাবকে মদিনায় পাঠিয়ে দেন। আবুল আস বড় একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। ঘটনাক্রমে দ্বিতীয়বার শাম থেকে ব্যবসাপণ্য নিয়ে আসার সময় পথিমধ্যে মুসলিমদের হাতে বন্দি হন এবং এবারও তাঁকে বিনা মুক্তিপণে ছেড়ে দেওয়া হয়। দ্বিতীয়বারের মতো মুক্তি পেয়ে তিনি মক্কায় চলে যান এবং সকল অংশীদারের মাল তাদের বুঝিয়ে দিয়ে মুসলমান হয়ে যান। এরপর তিনি লোকদের বলেন, 'আমার কাছে তোমাদের আর কোনো পাওনা আছে?' জবাবে তারা বলে, 'না, আল্লাহ তোমাকে উত্তম পুরস্কার দিন। আমরা তোমাকে চমৎকার প্রতিশ্রুতি পালনকারী হিসেবে পেয়েছি।' আবুল আস বলেন, 'আমি তোমাদের হক পূর্ণরূপে আদায় করেছি। এখন আমি ঘোষণা দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং নিশ্চয় মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসুল।' মদিনায় অবস্থানকালে আমি এ ঘোষণা দিতে পারতাম; কিন্তু এ জন্য দিইনি যে, তোমরা তখন ধারণা করতে, আমি তোমাদের মাল আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যেই এমনটি করেছি; অথবা আমাকে জোরপূর্বক মুসলমান বানানো হয়েছে।' আল্লাহ যখন আমাকে দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছেন, তখনই আমি ইসলামের ঘোষণা দিচ্ছি।

এরপর আবুল আস রা. মদিনায় রাসুলের ﷺ খিদমতে হাজির হন। রাসুল ﷺ তাঁকে সসম্মানে বরণ করেন এবং স্ত্রী জায়নাবকেও তাঁর হাতে তুলে দেন।

## বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবাদের রাঃ মর্যাদা:

বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবীরা রা. বিশেষ সম্মানে সম্মানিত। জিবরীল আ. রাসুলুল্লাহকে ﷺ একদিন জিজ্ঞেস করলেন, 'বদরে অংশ নেওয়া সাহাবীদের রা. আপনি কী হিসেবে বিবেচনা করেন?' রাসুলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন, 'মুসলিমদের মধ্যে তারা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ।' জিবরীল আ. বললেন, 'বদর যুদ্ধে অংশ নেওয়া ফেরেশতারাও অনুরূপ।' বদর শুধুমাত্র মুসলিমদের জন্য নয় বরং সে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ফেরেশতাদের জন্যেও বিশেষ একটি ঘটনা।

## ইহুদীদের ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনাসমূহ:

ইহুদিদের অন্যতম ষড়যন্ত্র ছিল মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা। এর একটি বড় উদাহরণ হলো আউস ও খাযরাজ গোত্রের মধ্যে পুরনো শত্রুতার উসকানি। শাস ইবনে কায়েস নামের এক বৃদ্ধ ইহুদি মুসলমানদের সম্প্রীতি দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে এক যুবককে পাঠায়, যে তাদের জাহেলি যুগের বুআস যুদ্ধ ও শত্রুতার স্মৃতি উসকে দেয়। তার প্ররোচনায় আউস ও খাযরাজের সাহাবিরা উত্তেজিত হয়ে যুদ্ধের উপক্রম করেন। এই পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্রুত সেখানে উপস্থিত হন এবং তাদের সতর্ক করে বলেন, "তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। জাহেলিয়াতের সেই শত্রুতাকে কি তোমরা ফিরিয়ে আনতে চাও, যখন আমি তোমাদের মাঝে আছি? আল্লাহ তোমাদের ঈমানের পথে ঐক্যবদ্ধ করেছেন।" রাসূল ﷺ-এর কথা শুনে তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারেন এবং পরস্পরের সঙ্গে কোলাকুলি করে ভুলের জন্য ক্ষমা চান। এ ঘটনা উপলক্ষে আল্লাহ তাআলা কুরআনে মুসলমানদের একতা রক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন,

*"তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং বিচ্ছিন্ন হয়ো না। স্মরণ করো আল্লাহর অনুগ্রহ, যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, আর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে সম্প্রীতি সৃষ্টি করেন। ফলে, তোমরা তাঁর অনুগ্রহে ভাই ভাই হয়ে গেলে।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১০৩)*

## ইসলাম নিয়ে বিদ্রুপ ও তামাশা করা:

ইহুদীদের খুব সাধারণ একটি কাজ ছিল, ইসলাম নিয়ে ক্রমাগত বিদ্রুপ ও তামাশা করা। একদিন আবু বকর রাঃ ফিনহাস নামক এক ইহুদি পণ্ডিতকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। তখন ফিনহাস বিদ্রুপ করে বলল, "তোমার রব গরীব আর আমরা হলাম ধনী। যদি তোমাদের রব ধনী হয়ে থাকে তাহলে কেন তিনি তোমাদেরকে দান খয়রাত করতে বলেন? এটাই প্রমাণ করে যে, তিনি অভাবী আর আমরা ধনী। আমাদেরকেই তার প্রয়োজন"। একথা শুনে আবুবকর প্রচন্ড রেগে গেলেন। তিনি ফিনহাসের মুখে ঘুষি মেরে। দিলেন। সে রাসূল সাঃ-এর কাছে

এসে অভিযোগ পেশ করলে রাসূল সাঃ আবু বকরকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। আবু বকর সবকিছু খুলে বললেন কিন্তু সেই ব্যক্তি কটুক্তি করার কথা অস্বীকার করল। তখন আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন-

*'নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের কথা শুনেছেন, যারা বলেছে যে, আল্লাহ হচ্ছেন অভাবগ্রস্ত আর আমরা বিত্তবান! এখন আমি তাদের কথা এবং যেসব নবীকে তারা অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে তা লিখে রাখব, অতঃপর বলব, আস্বাদন কর জ্বলন্ত আগুনের আযাব। এ*
*হল তারই প্রতিফল যা তোমরা ইতিপূর্বে নিজের হাতে পাঠিয়েছ। বস্তুতঃ আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অত্যাচার করেন না। (সূরা আলে ইমরান, ৩:১৮১-১৮২)*

ইহুদীরা নিয়মিতভাবে মুসলিমদের সম্পর্কে আজেবাজে কথা বলত, ব্যাঙ্গ করত, দ্বীন ইসলামকে নিয়ে কটাক্ষ করতো। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন-

*অবশ্য ধন-সম্পদে এবং জনসম্পদে তোমাদের পরীক্ষা হবে এবং অবশ্য তোমরা শুনবে পূর্ববর্তী আহলে কিতাবদের কাছে এবং মুশরেকদের কাছে বহু অশোভন উক্তি। আর যদি তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর এবং পরহেযগারী অবলম্বন কর, তবে তা হবে একান্ত সৎসাহসের ব্যাপার। (সূরা আলে ইমরান, ৩:১৮৬)*

## রাসূল সাঃ-এর সাথে বেয়াদবি:

একদিন একদল ইহুদি রাসূল সাঃ-এর সামনে এসে বলল, 'আসসামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ'। কথাটি শুনতে 'আসসালামু আলাইকা' মনে হলেও এর অর্থ হল 'তোমার মৃত্যু হোক'। আয়েশা রাঃ এ কথা শুনে খুবই
রেগে গেলেন। তিনি ইহুদিদেরকে অভিশাপ দিতে লাগলেন। তখন রাসূল সাঃ বললেন, "এভাবে বলো না, আল্লাহ নোংরা ভাষা পছন্দ করেন না"। এই প্রেক্ষাপটেই আল্লাহ নাযিল করেন-

আপনি কি ভেবে দেখেননি, যাদেরকে কানাঘুষা করতে নিষেধ করা হয়েছিল অতঃপর তারা নিষিদ্ধ কাজেরই পুনরাবৃত্তি করে এবং পাপাচার, সীমালংঘন এবং রসূলের অবাধ্যতার বিষয়েই কানাঘুষা করে। তারা যখন আপনার কাছে আসে, তখন আপনাকে এমন ভাষায় সালাম করে, যদ্দ্বারা আল্লাহ আপনাকে সালাম করেননি। তারা মনে মনে বলেঃ আমরা যা বলি, তজ্জন্যে আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেন? জাহান্নামই তাদের জন্যে যথেষ্ট। তারা তাতে প্রবেশ করবে। কতই না নিকৃষ্ট সেই জায়গা। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮:৮)

ইহুদীরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত যে, তারা যে এত আজেবাজে কথা বলছে ইসলাম ও মুসলিমদের নিয়ে তবুও কেন আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিচ্ছেন না? এর অর্থ নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল নন (আস্তাগফিরুল্লাহ)।

## ইহুদিরা ছিল মুনাফিক্বদের আধ্যাত্মিক গুরু:

মুনাফিকরা ইহুদিদের সাথে গোপনে দেখা করত এবং ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করত। কিছু কিছু ব্যাপারে আমরা তোমাদের কথা মত চলবো এই কথাটি ইহুদীদের উদ্দেশ্যে মুনাফিকরা বলতো। আল্লাহ এখানে বলছেন- কাফির হওয়ার জন্য ইহুদি হওয়ার দরকার নেই কিংবা তাদের সাথে পুরোপুরি একমত হওয়া জরুরী নয়। বরং কাফিরদের সাথে কিছু বিষয়ে অন্তর থেকে একমত পোষণ করা-ই কাফির হওয়ার জন্য যথেষ্ট"। বর্তমান সময়ে মুসলিমদের এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে অত্যন্ত সতর্ক হওয়া জরুরি।

## ইসলামী দাওয়াহর বিরোধিতা:

ইসলামী দাওয়াহর বিরোধিতা করা ইহুদিদের আরেকটি ষড়যন্ত্রমূলক কৌশল ছিল। সুযোগ পেলেই ইসলামী দাওয়াতের বিরোধিতা করা, মানুষকে মুসলিম হওয়া থেকে বিরত রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা এবং যারা মুসলিম হয়ে যেত তাদেরকে নানাবিধ অপবাদ দিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা ও অপমান করা ছিল ইহুদিদের নিত্যদিনের কাজ। নবীজি ﷺ একদিন বাজারে গিয়ে তাদেরকে দাওয়াত দিলেন এবং বললেন, "হে ইহুদি সম্প্রদায়! তোমাদের বলছি তোমরা সতর্ক হও। আল্লাহ কুরাইশদের মতো করে তোমাদেরকেও শাস্তি দেবেন। তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো, তোমরা ঠিকই জানতে পারবে যে, আমি আল্লাহর রাসূল। তোমরা তোমাদের কিতাবেই তার প্রমাণ পাবে এবং আল্লাহর সাথে তোমরা যে ওয়াদা করেছ তার প্রমাণ পাবে"। উত্তরে তারা বলল, "মুহাম্মদ! তুমি কি মনে করো আমরা তোমাদের সাথে আছি? ভ্রান্তির মধ্যে থেকো না; যাদের তুমি হারিয়েছো তাদের যুদ্ধ সম্পর্কে তেমন জ্ঞান নেই তাই, তুমি তাদের হারাতে পেরেছ। আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে আসলে টের পাবে সত্যিকারে যোদ্ধা কাকে বলে!" এই প্রসঙ্গে আল্লাহ নাজিল করেন-

কাফেরদিগকে বলে দিন, খুব শিগগীরই তোমরা পরাভূত হয়ে দোযখের দিকে হাঁকিয়ে নীত হবে-সেটা কতই না নিকৃষ্টতম অবস্থান। নিশ্চয়ই দুটো দলের মোকাবিলার মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিল। একটি দল আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করে। আর অপর দল ছিল কাফেরদের এরা স্বচক্ষে তাদেরকে দ্বিগুন দেখছিল। আর আল্লাহ যাকে নিজের সাহায্যের মাধ্যমে শক্তি দান করেন। এরই মধ্যে শিক্ষনীয় রয়েছে দৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য। (সূরা আলে ইমরান, ৩:১২-১৩)

## বনু কায়নুকার বিরুদ্ধে অভিযান:

মদীনার ইহুদি গোত্র বনু কায়নুকা ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি শুরু থেকেই বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব পোষণ করত। তারা মদীনা সনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল না এবং বারবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতো। বদর যুদ্ধের পর একদিন একটি অপমানজনক ঘটনার মাধ্যমে তাদের প্রকাশ্য শত্রুতার রূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

একজন মুসলিম মহিলা অলংকার কেনার জন্য বনু কায়নুকার বাজারে যান। ইহুদি ব্যবসায়ীরা তাঁর মুখের পর্দা সরাতে চায়, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। এ সময় এক ইহুদি দোকানদার তার সাথে প্রতারণা করে মাটিতে পেরেক দিয়ে তাঁর পোশাক আটকে দেয়। উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলে তাঁর পর্দা সরে যায়। এতে তিনি চিৎকার করে ওঠেন। এ দৃশ্য দেখে একজন মুসলিম পুরুষ ক্ষুব্ধ হয়ে ইহুদি দোকানদারকে হত্যা করেন। প্রতিশোধ নিতে ইহুদিরা ওই মুসলিমকে হত্যা করে।

এই ঘটনার পর পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘটনাটি শুনে মুহাজির ও আনসারদের সমন্বয়ে একটি সেনাদল প্রস্তুত করেন। তিনি বনু কায়নুকার দুর্গ অবরোধ করেন এবং চুক্তি বাতিল ঘোষণা করেন। অবরোধ ১৫ দিন ধরে চলে। ভয় ও দুশ্চিন্তায় ইহুদিরা আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়।

অবরোধের সময় মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবন উবাই ইহুদিদের পক্ষ নিয়ে তাদের মুক্তি দাবি করে। আল্লাহর রাসূল ﷺ প্রথমে তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু আবদুল্লাহ বারবার তদবির করতে থাকলে শেষমেশ রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের হত্যা না করে মদীনা থেকে বহিষ্কার করার নির্দেশ দেন।

বনু কায়নুকার লোকজন শামের দিকে পাড়ি জমায়। তাদের কাছ থেকে যুদ্ধের গনিমত আদায় করা হয় এবং তা মুসলিমদের মাঝে বণ্টন করা হয়। এ অভিযানের মাধ্যমে মদীনায় ইসলামবিরোধী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কঠোর বার্তা প্রেরিত হয়।

## কা'ব বিন আশরাফের ঘটনা:

কা'ব বিন আশরাফ ছিলেন এক প্রভাবশালী ইহুদি কবি ও ধনী ব্যক্তি, যিনি মুসলিমদের প্রতি তার শত্রুতা প্রকাশ্যে প্রকাশ করতেন। বদর যুদ্ধে মুসলিমদের বিজয়ের সংবাদ পেয়ে তিনি গভীরভাবে শোকাহত হন এবং মুসলিমদের নিয়ে অশ্লীল কবিতা রচনা শুরু করেন। তিনি সাহাবিদের স্ত্রীদের সম্পর্কে নিন্দনীয় কবিতা লিখতেন এবং ইসলাম ও রাসূল-কে ব্যঙ্গ করতেন। ইসলামের দৃষ্টিতে নারীদের মর্যাদা রক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় এই অপমান মুসলিম সমাজে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কবিতার জবাবে হাসসান বিন সাবিত রা.-কে দায়িত্ব দেন। হাসসান রা. কা'বের কবিতার বিরুদ্ধে এমন চমৎকার জবাব দেন যে, কা'ব তার সমাজে নিন্দিত হয়ে পড়েন। পরবর্তীতে, কা'ব মদিনায় চলে আসে এবং ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। কা'বের শত্রুতার চূড়ান্ত পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের জিজ্ঞেস করেন, "কে এমন সাহসী যে এই শত্রুর হাত থেকে আমাদের মুক্তি দিতে পারে?" মুহাম্মাদ বিন মাসলামা রা. এই দায়িত্ব নিতে সম্মত হন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছ থেকে কা'বকে হত্যা করার জন্য কৌশলগত মিথ্যার অনুমতি নিয়ে মুহাম্মাদ বিন মাসলামা রা. এবং তার সহযোগীরা একটি পরিকল্পনা তৈরি করেন। তারা কা'বের সাথে বন্ধুত্বের ভান করে তার বিশ্বস্ততা অর্জন করেন। অস্ত্র বন্ধক রেখে খাবার ধার নেওয়ার প্রস্তাব দিয়ে তারা তাকে দুর্গের বাইরে ডেকে আনেন।

তৃতীয় হিজরির ১৪ রবিউল আউয়ালের রাতে কা'বকে তার বাসা থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। মুহাম্মাদ বিন মাসলামা রা. তার সৌরভের প্রশংসা করে নিকটবর্তী হওয়ার সুযোগ নেন। পূর্বনির্ধারিত সংকেত অনুযায়ী, সাহাবিরা একযোগে কা'বের ওপর আক্রমণ করেন। বেশ কয়েকটি আঘাতের পর মুহাম্মাদ বিন মাসলামা রা. তাকে ছুরি দিয়ে হত্যা করেন। সাহাবিরা দ্রুত মদিনায় ফিরে আসেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সাফল্যের জন্য আল্লাহর প্রশংসা করেন।

# বদর ও উহুদের মধ্যবর্তী সামরিক কর্মকাণ্ড

## ১। গাযওয়ায়ে কুদর:

বদর যুদ্ধের দিন সাতেক পর দ্বিতীর হিজরীর শাওয়াল মাসে রাসূল সাঃ-এর নিকট খবর আসে যে, বনু গাতফান এর শাখাগোত্র বনু সুলাইম মদিনা আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তখন নবীজি তাদের শায়েস্তা করার জন্যে ২০০ উষ্ট্রারোহী সৈন্য নিয়ে তাদের বাসভূমিতে যান। কুদর নামক স্থানে পৌঁছানোর পর বনু সুলাইম পালিয়ে যায় এবং তাদের পাঁচশ উট ও একটি গোলাম রেখে যায়। রাসূল সাঃ গোলামটিকে আযাদ করে দেন আর উটগুলো সাহাবিদের মাঝে ভাগ করে দেন। সেখানে ৩ দিন অবস্থানের পর রাসূল সাঃ বাহিনী নিয়ে মদীনায় ফিরে আসেন।

## ২। গাযওয়ায়ে সাওয়ীক:

আবু সুফিয়ান বদরের যুদ্ধের লজ্জাকর পরাজয়ের পর পুনরায় মুসলিমদের সাথে লড়াই করার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে। সে শপথ করে যে, মুসলিমদের উপযুক্ত প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত সে জানাবাতের গোসল করবে না। সে প্রায় দুইশ অশ্বারোহী নিয়ে মদিনা আক্রমণের জন্যে রওনা হয় এবং সাইব নামক স্থানে তাবু স্থাপন করে। সে মদীনায় হুয়াই বিন আখতাবের বাড়িতে রাত্রিযাপনের অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দিলেন না। এরপর সে বনু নাযীরের সাল্লাম ইবনু মিশকাম এর বাড়িতে রাত্রিযাপন এবং মদ্যপান করে। ভোরবেলা সরাসরি মদিনা আক্রমণের সাহস না পেয়ে আবু সুফিয়ান তার বাহিনীকে মদিনার আশেপাশের এলাকায় ডাকাতি-লুণ্ঠন শুরু করার নির্দেশ দেয়। তার দল মদিনার পার্শ্ববর্তী উরাইয নামক বস্তিতে আক্রমণ করে, কিছু খেজুর গাছ কেটে ফেলে এবং আগুন জ্বালিয়ে দেয়। এসময় তারা একজন আনসার ও তার মিত্রকেও হত্যা করে মক্কায় ফিরে আসে।

রাসূল সাঃ এ খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ আবু লুবাবা ইবনে আব্দুল মুনযির রাঃ এর কাছে মদিনার দায়িত্ব দিয়ে সাহাবিদের একটি দল নিয়ে তাদের পেছনে ধাওয়া করে। কিন্তু আবু সুফিয়ান তার আগেই পালিয়ে যায় এবং পালানোর সুবিধার্থে অনেক 'সাওয়ীক' অর্থাৎ ছাতু ফেলে রেখে যায়। নবীজি 'কুরকুরাতুল কুরদ' নামক স্থান পর্যন্ত পৌছে আবার মদিনায় ফিরে আসেন। এ সময় তারা যে ছাতু ফেলে গিয়েছিল তা মুসলমানেরা তুলে আনে। এভাবে এ যুদ্ধের নাম হয় 'গাযওয়ায়ে সাওয়ীক' বা 'ছাতুর যুদ্ধ'।

## ৩। গাযওয়ায়ে যূ আমর/গাযওয়ায়ে গাতফান:

তৃতীয় হিজরীর মুহাররম মাসে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বদর ও উহুদের যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে এটিই ছিল সবচেয়ে বড় সামরিক হামলা। নবীজির কাছে খবর পৌঁছায় বনু সালামা ও বনু মুহারেবের এক বিশাল সেনাবাহিনী মদিনার আশেপাশের এলাকা আক্রমণের জন্যে একত্রিত হয়েছে। এ খবর শুনে রাসূল সাঃ ৪৫০ পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে মদিনা থেকে রওনা দেন। এ সময়ে মদিনায় দায়িত্ব দিয়ে যান উসমান ইবনে আফফান রাঃ এর কাছে।

পথে সাহাবীগণ বনু সালামা গোত্রের জুবার নামক এক ব্যক্তিকে আটক করে রাসূল সাঃ এর কাছে নিয়ে আসেন। তিনি তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন এবং সে মুসলিম হয়ে যায়। তার পথ নির্দেশনামতো মুসলিমরা শত্রুবাহিনীর ভূমি পর্যন্ত পৌঁছায়। শত্রুরা মদিনা বাহিনীর আগমনের খবর পেয়ে বিভিন্ন গুহায় লুকিয়ে পড়ে। রাসূল সাঃ তার বাহিনী নিয়ে শত্রুদের সমবেত হওয়ার স্থানে পৌঁছেন। সেখানে 'য আমর'নামে একটি প্রস্রবণ ছিল। তারা সেখানে ৩য় হিজরীর পুরো সফর মাস বা তার কিছু সময় অতিবাহিত করেন-যেন বেদুঈন যাযাবর জাতিদের অন্তরে মুসলিমদের ব্যাপারে ত্রাসের সৃষ্টি হয়।

## ৪। সারিয়ায়ে যায়েদ বিন হারিসা:

উহুদের যুদ্ধের পূর্বে এটিই ছিল সর্বশেষ ও সর্বাধিক সফল একটি সামরিক অভিযান, যা ৩য় হিজরীর জুমাদাল উখরাতে সংঘটিত হয়। কুরাইশদের গ্রীষ্মকালীন সিরীয় বানিজ্যের মৌসুম ঘনিয়ে এলে তারা মুসলিমদের আক্রমণের আশংকায় ভীত হয়ে আসওয়াদ ইবনু আব্দুল মুত্তালিবের পরামর্শক্রমে কাফেলার পথ পরিবর্তন করে উপকূলের রাস্তা ছেড়ে ইরাকের রাস্তা ধরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। নতুন পথ দিয়ে সফর করার জন্যে তারা ফুরাত ইবনে হাইয়্যানকে রাহবার হিসেবে গ্রহণ করে।এদিকে সালীত ইবনে নুমান কৌশলে এ সফরের খবর বের করে মদিনায় পৌঁছে দেয়। রাসূল সাঃ তৎক্ষণাৎ যায়দ বিন হারেসা কালবীর নেতৃত্বে ১০০ অশ্বারোহীর দল প্রস্তুত করে দেন। কুরাইশরা যাত্রাবিরতির জন্যে 'কারদা' নামক স্থানে থামলে যায়েদ তার বাহিনী নিয়ে অতর্কিত হামলা চালান। হঠাৎ এ আক্রমণের কবলে পড়ে সফওয়ান ও তার কাফেলার প্রহরীরা পালিয়ে জান বাঁচায় এবং মুসলিম বাহিনী সফলভাবে বিজয়ী হয়। ফুরাত ইবনে হাইয়্যানকে বন্দী করা হয়, সে পরবর্তীতে রাসূল সাঃ এর কাছে ইসলাম গ্রহণ করে। এই অভিযান থেকে প্রায় এক লাখ দিরহাম পরিমাণ গনিমতের মাল পাওয়া যায়; যা নবীজি মুজাহিদদের মাঝে বন্টন করে দেন।

## উহুদযুদ্ধ: প্রেক্ষাপট ও প্রস্তুতি

উহুদ মদিনা থেকে প্রায় তিন মাইল দূরের একটি পাহাড়ের নাম। সবার ঐকমত্যে উহুদের যুদ্ধ তৃতীয় হিজরির শাওয়ালে সংঘটিত হয়।

বদরযুদ্ধে মক্কার মুশরিকদের পরাজয় ও অপমানের গ্লানি এবং সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় লোকদের হত্যার ফলে দুঃখের বোঝা তাদের বহন করতে হচ্ছিল। এই শোক, ক্ষোভ- দুঃখ নিয়ে যদিও তারা একটি বছর পার করেছে; কিন্তু মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্রোধ ও প্রতিহিংসার আগুনে দগ্ধ হচ্ছিল। এমনকি তাদের নিহতদের জন্য শোক প্রকাশ করতেও লোকদের নিষেধ করে দিয়েছিল। এ পর্যায়ে তারা যুদ্ধপ্রস্তুতি সম্পন্ন করে ৩ হাজার সেনার বিশাল বাহিনী নিয়ে মদিনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে ৭০০ বর্ম, ২০০ ঘোড়া এবং ৩ হাজার উট ছিল। এমনকি ১৪ জন মহিলাকে তারা এ জন্য সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল যে, এরা তাদের পুরুষদের আত্মমর্যাদাবোধ জাগিয়ে তুলবে এবং যারা পালাতে চায়, এরা তাদের তিরস্কার ও লজ্জা দেবে।

এদিকে নবিজির চাচা আব্বাস রা.-যিনি এ সময় ইসলাম কবুল করে নিয়েছেন, তবে তখনো মক্কাতেই ছিলেন-কুরাইশদের এমন আয়োজন ও যুদ্ধপ্রস্তুতি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করছিলেন এবং এতে তিনি অত্যন্ত বিচলিতবোধ করেন। এ জন্য তিনি এর বিস্তারিত সংবাদ জানিয়ে চিঠিসহ দ্রুতগামী একজন দূতকে মদিনায় নবিজির কাছে পাঠিয়ে দেন।

নবিজি ﷺ এ সম্পর্কে অবগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুজন লোককে সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য পাঠান। তাঁরা ফিরে এসে তাঁকে সংবাদ দেন যে, কুরাইশরা মদিনার উপকণ্ঠে এসে গেছে। যেহেতু মদিনা শহরে আক্রমণের আশঙ্কা ছিল, তাই শহরের চারদিকেই পাহারার ব্যবস্থা করা হয়। সকালে নবিজি ﷺ সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। এরপর ১ হাজার সেনার এক বাহিনী নিয়ে মদিনার বাইরে চলে আসেন। এ বাহিনীতে মুনাফিকদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনু উবাই ও তার সমমনা ৩০০ মুনাফিকও ছিল। তবে তারা পথিমধ্যেই বাহিনী ছেড়ে ফিরে আসে। ফলে মুসলিমদের সৈন্যসংখ্যা কমে ৭০০ জনে দাঁড়ায়।

## সেনাবিন্যাস ও সাহাবিদের জিহাদি স্পৃহা:

মদিনা থেকে বেরোনোর পর মুজাহিদের যখন চূড়ান্ত যাচাই-বাছাই করা হয়, তখন অল্পবয়সি কিশোর মুজাহিদদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এ-সকল কিশোরের অন্তরে জিহাদের প্রতি আন্তরিকতা ও স্পৃহা ছিল অতুলনীয়। রাফি ইবনু খাদিজকে যখন বলা হয়, 'তোমার বয়স কম,

তুমি মদিনায় ফিরে যাও।' তখন তিনি পায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়ান, যেন তাঁকে লম্বা ও উঁচু মনে করা হয়! তাঁর আগ্রহ দেখে শেষপর্যন্ত তাঁকে বাহিনীতে যুক্ত করা হয়। এ ছাড়া সামুরা ইবনু জুনদুব রা.- যিনি রাফি ইবনু খাদিজের সমবয়সি ছিলেন-তিনি যখন এ ঘটনা দেখেন, তখন নবিজির কাছে আবেদন করেন, 'আমি তো রাফিকে মল্লযুদ্ধে পরাস্ত করে থাকি। তাঁকে যদি যুদ্ধের জন্য মনোনীত করা হয়, তাহলে তো আমাকে আরও আগেই নেওয়া উচিত!' তাঁর কথামতো রাফি ও সামুরাকে কুস্তিতে লাগিয়ে দেওয়া হয়। কুস্তিতে সামুরা রাফি ইবনু খাদিজকে পরাস্ত করেন। ফলে তাঁকেও বাহিনীতে যুক্ত করা হয়।

এরপর উহুদের ময়দানে পৌঁছে রাসুল ﷺ মুজাহিদদের বিন্যাস করে কাতারবন্দি করে দাঁড় করান। উহুদ পাহাড়কে পেছনে রেখে যুদ্ধের কৌশল ঠিক করেন। কেননা, এ দিক দিয়ে শত্রুদের এগিয়ে আসার আশঙ্কা ছিল। ফলে এই কৌশল একদিকে ছিল ঝুঁকিপূর্ণ আবার অন্যদিকে সুবিধাজনক বটে। উহুদের পেছন দিক থেকে একজায়গা দিয়ে হামলার আশঙ্কা ছিল, এ জন্য নবিজি সেখানে ৫০ জনের এক তিরন্দাজ বাহিনীকে পাহারার দায়িত্ব দিয়ে কঠোরভাবে তাঁদের নির্দেশ দেন, 'মুসলিমদের জয়-পরাজয় যা-ই হোক না কেন, সর্বাবস্থায় তোমরা এখানে অটল থাকবে।'

## যুদ্ধ শুরু:

যুদ্ধের শুরুতে আবু সুফিয়ান মুসলিমবাহিনীর মধ্যে ফাটল ধরানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু সাহাবীরা রা. তাঁর এই প্রচেষ্টা সফল হতে দেয় নি।

এরপর যুদ্ধ শুরু হয়। শুরুতে আলি ইবনু আবি তালিব রা. এর সাথে কাফিরবাহিনীর পতাকাবাহক তালহা ইবনু উসমানের মধ্যে মল্লযুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে আলি রা. জয়ী হন। দীর্ঘক্ষণ যুদ্ধের পর মুসলিমবাহিনী কুরাইশদের পিছু হটাতে সক্ষম হয়। কিন্তু তখনও যুদ্ধ শেষ হয়নি। এ পর্যায়ে মুসলিমবাহিনী বিজয়ী হিসেবে যুদ্ধময়দানে অবস্থান করে; আর কুরাইশরা মনোবল হারিয়ে এদিকে-সেদিক পালাতে থাকে। মুসলিম সেনারা তখন যুদ্ধময়দানে গনিমত সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।

## তীরন্দাজ বাহিনীর ভুল:

এ দৃশ্য দেখে পাহাড়ের ওই গুরুত্বপূর্ণ স্থানে নবিজি ﷺ যে ৫০ জন সেনাকে পাহারায় নিযুক্ত করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। ফলে তাঁদের অনেকে মুসলিমদের বিজয় হয়েছে মনে করে নিশ্চিন্ত মনে সেখান থেকে চলে আসেন। তবে তাঁদের নেতা আবদুল্লাহ ইবনু

জুবায়ের রা. বার বার নিষেধ করছিলেন; কিন্তু তাঁরা তাঁদের নেতার কথা মানেননি। তবে এরপরও কয়েকজন সেখানে থেকে যান।

এ জায়গাটি প্রায় ফাঁকা দেখে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ- যিনি তখনো মুসলমান হননি এবং কুরাইশের পক্ষে যুদ্ধ করছিলেন- পেছন দিক থেকে আচমকা আক্রমণ করে যুদ্ধের দৃশ্য পালটে দেন। তখন আবদুল্লাহ ইবনু জুবায়েরসহ তাঁর সঙ্গে থাকা অল্প কয়েকজন সাহাবি প্রাণপণ লড়াই চালিয়ে যান, তবে শেষপর্যন্ত সবাই শাহাদতবরণ করেন। এবার পথ পরিষ্কার হয়ে যায়। খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ তাঁর বাহিনী নিয়ে মুসলিমদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। মুসলমান ও কাফির উভয় বাহিনী তখন যুদ্ধময়দানে এমনভাবে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় যে, মুসলমান মুসলমানের হাতেই নিহত হতে থাকেন।

## রাসূল ﷺ এর উপর হামলা:

যুদ্ধক্ষেত্রের পরিস্থিতি অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে এবং যুদ্ধ ভয়াবহ আকার ধারণ করে। রাসুলুল্লাহ ﷺ সিদ্ধান্ত নিলেন নিজের জীবন বিপন্ন করে হলেও মুসলিমদের ময়দানে ফিরিয়ে আনবে। তিনি ডেকে উঠলেন, 'আল্লাহর বান্দারা! তোমরা এগিয়ে আসো!' আর যা হওয়ার তাই হলো, সেই ডাক কুরাইশ বাহিনীও শুনে ফেলে। তারা মুসলিমদের এগিয়ে আসার আগেই রাসুলুল্লাহ ﷺ এর দিকে হামলা চালায়।

সেই প্রচেষ্টায় উতবা ইবনু আবি ওয়াক্কাস রাসুলুল্লাহর ﷺ গায়ে পাথর ছুড়ে মারে। সেই ধাক্কায় রাসুলুল্লাহ ﷺ মাটিতে পড়ে যান। তাঁর ঠোঁট কেটে যায়। দ্বিতীয় মারাত্মক আঘাতটিও হানে উতবা। এই আঘাতটি ছিল তীরের আঘাত। এই আঘাতে রাসুলুল্লাহর ﷺ দাঁত ভেঙ্গে যায়। আর তৃতীয় আঘাত হানে ইবনে কামিয়াহ। সে ঘোড়ায় চড়ে এসে তরবারি দিয়ে রাসুলুল্লাহর ﷺ মুখে আঘাত করার চেষ্টা করে। তালহা তাঁর ঢাল হয়ে দাঁড়ায় তারপরও রাসুলুল্লাহর ﷺ শিরস্ত্রাণে তরবারির আঘাত লাগে।

## মুসআব ইবনু উমায়ের রা. এর শাহাদাত:

এ যুদ্ধে মুসআব ইবনু উমায়ের রা. শহিদ হন। তাঁর চেহারার সঙ্গে নবিজির চেহারার অনেক মিল ছিল। ফলে তাঁর শাহাদাতের পর গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, রাসুল ﷺ শহিদ হয়েছেন। এ ঘোষণা বা এই মিথ্যা সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহাবিদের মনোবল ভেঙে যায়। এমনকি বড় বড় অনেক সাহাবিও হতাশ হয়ে যান। তবে অনেকে তখনো অত্যন্ত বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যান। বিশৃঙ্খলার কারণে মুসলিমদের হাতে মুসলিমরা শহিদ হতে থাকেন। তবে সবার দৃষ্টি তখন নবিজিকে খুঁজে ফিরছিল। এরপর কা'ব ইবনু মালিক রা. প্রথমে তাঁকে দেখতে

পান। তিনি আনন্দের আতিশয্যে চিৎকার দিয়ে ওঠেন, 'মুবারক হো, নবিজি নিরাপদ ও সুস্থ আছেন।'

## সাহাবীদের আত্মত্যাগ:

কাআব ইবনু মালিকের এ আওয়াজ যখন সাহাবিরা শুনতে পান, তখন সবাই নবিজির কাছে দৌড়ে আসতে থাকেন। এ সময় কাফিররা অন্য দিক থেকে সরে এসে এদিকে মনোনিবেশ করে। তারা কয়েকবার নবিজির ওপর আক্রমণ করতে উদ্যত হয়, তবে তিনি নিরাপদই থাকেন। এমনকি কাফিররা একবার কঠোর আক্রমণ করলে তিনি সাহাবিদের উদ্দেশ্য করে বলেন, 'যে আজ শত্রুদের রুখে দিতে পারবে, সে জান্নাতে আমার সঙ্গী হবে!' এই আহবান শুনে একজন আনসার এগিয়ে এলেন। শত্রুদের উপর তীর ছুড়তে ছুড়তে শহীদ হয়ে গেলেন। এভাবে করে সাতজন আনসার সাহাবী শহীদ হন।

সাতজন সাহাবি শহীদ হয়ে যাবার পর রাসূলুল্লাহর ﷺ সাথে ছিলেন আর মাত্র দু'জন, তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ এবং সা'দ ইবন আবি ওয়াক্কাস। রাসূলুল্লাহকে ﷺ আঘাত করেছিল উতবা ইবন আবি ওয়াক্কাস। আর রাসূলুল্লাহর ﷺ প্রতিরক্ষায় দাঁড়িয়ে গেলেন তারই আপন ভাই সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাস! তীরের পর তীর ছুঁড়তে থাকেন শত্রুদের লক্ষ্য করে। আলী ইবন আবি তালিব বলেন, 'আমি কখনো রাসূলুল্লাহকে তাঁর বাবা-মা উভয়ের নামে শপথ করতে শুনিনি। একমাত্র সাদ ইবন আবি ওয়াক্কাসকে তিনি এমনটা বলেছিলেন। উহুদের ময়দানে আল্লাহর রাসূল বলে ওঠেন, 'তীর ছোঁড়ো, সাদ! আমার বাবা-মা তোমার জন্য কুরবান হোক!' তালহা ইবন উবায়দুল্লার অসাধারণ বীরত্ব দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'তালহা তো জান্নাতের জন্য নিজেকে যোগ্য করে নিয়েছে।' রাসূলুল্লাহকে ﷺ বাঁচাতে গিয়ে তরবারির আঘাতে তালহার কিছু আঙুল কাটা পড়ে। উহুদের সেই দিনে তালহা নিজের গায়ে অন্তত ৩৫টি আঘাত সয়ে নেন। তাঁর ডান হাত তীরের আঘাতে অবশ হয়ে যায়। তালহার সম্মানে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন, 'যদি কেউ জমিনের বুকে কোনো জীবিত শহীদকে চলাফেরা করা অবস্থায় দেখতে চায়, সে যেন তালহাকে দেখে নেয়।'

এক পর্যায়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। নিশ্চিত বিজয় টের পেলেও মুশরিকরা মুসলিমদের বীরত্বের প্রদর্শনী ও জীবন উৎসর্গকারী আক্রমণের মুখে পিছু হটতে বাধ্য হয়। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে উহুদের একটি উপত্যকার দিকে যায়। হতাশ কাফিররা তখন মুসলিমদের পিছু ধাওয়া না করে নিজেদের গন্তব্যে ফিরে যায়।

## হানযালাতুল গাসীল এর বীরত্ব ও শাহাদাতঃ

সাহাবী হানযালা রাঃ ছিলেন ফাসিক আবু আমের এর পুত্র। এই সেই আবু আমের, যে যুদ্ধের শুরুতে আবু সুফিয়ানের কথা মতো আনসারদের বিভ্রান্ত করে ফেরত নিয়ে যেতে চাইছিল। তিনি ছিলেন নববিবাহিত। উহুদ যুদ্ধের ঘোষনা যখন দেওয়া হয় তখন তিনি তাঁর স্ত্রীকে আলিঙ্গন করছিলেন। যুদ্ধের ঘোষণা শোনামাত্রই তিনি জানাবাতের অবস্থাতেই যুদ্ধে শরিক হন। যুদ্ধের ময়দানে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে করতে তিনি আবু সুফিয়ানের একেবারে নিকটে পৌঁছে গিয়েছিলেন। আবু সুফিয়ানকে তরবারির আঘাত করতে যাবেন এমন সময় শাদ্দাদ ইবনে আওস তাঁকে আঘাত করে শহীদ করে দেন।

যুদ্ধের পর সাহাবীগণ দেখেন যে তাঁর লাশ শূণ্যে ভাসন্ত অবস্থায় তা থেকে পানি গড়িয়ে পড়ছে। সাহাবীগণ এই দৃশ্য রাসূল সাঃ এর কাছে জানালে তিনি হানযালা রাঃ এর স্ত্রীকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। তাঁর স্ত্রী জানালেন যে, হানযালা রাঃ জানাবাত অবস্থায় যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। রাসূল সাঃ বললেন- ফেরেশতারা তাঁকে গোসল দিচ্ছিল। এজন্য তাঁর নাম হয়ে যায় 'হানযালাতুল গাসীল'।

## হামজা রাঃ এর শাহাদাতঃ

হামজা রাঃ অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করছিলেন এবং তিনি শত্রুবাহিনীর যাকে সামনে পাচ্ছিলেন তাকেই কচুকাটা করছিলেন। ওয়াহশি ইবনু হারব নামে এক গোলাম কাপুরুষের মত পেছন থেকে বর্শা মেরে তাঁকে

শহীদ করে। সে জুবায়ের ইবনু মুতইমের গোলাম ছিল। জুবায়েরে চাচা তুআইমাহ ইবনু আদী বদরের যুদ্ধে

নিহত হয়েছিল। জুবায়ের বিন মুত'ইম ওয়াহশিকে বলল, "তুমি যদি মুহাম্মাদ এর চাচা হামযাহকে আমার চাচার বিনিময়ে হত্যা করো তবে তোমাকে আযাদ করে দেয়া হবে"। ওয়াহশি তার কথামতো সুযোগ বুঝে পেছন থেকে বর্শার আঘাতে হামজাকে শহীদ করে দেন। বর্শা হামজা রাঃ এর নাভির নিচে লাগে এবং দুই পায়ের মাঝ দিয়ে ভেদ করে বের হয়ে যায়। তিনি ওয়াহশিকে ধাওয়া করার ইচ্ছা করেন কিন্তু তার আগেই মাটিতে পড়ে যান। ওয়াহশি হামজা রাঃ এর দেহ থেকে বর্শা আলাদা করে নিয়ে যায় এবং এরপর তাকে আজাদ করে দেওয়া হয়। সে শুধুমাত্র নিজের মুক্তির জন্যই হামজা কে হত্যা করতে এসেছিল, আর কারো সাথে তার কোন শত্রুতা ছিল না।

যুদ্ধ শেষে মক্কায় ফিরে এলে সে আযাদ হয়ে যায়। মক্কা বিজয়ের পর তায়েফ থেকে যে প্রতিনিধিদল ইসলাম গ্রহণ করতে এসেছিলেন ওয়াহশি তাদের মধ্যে ছিলেন। লোকজন তাঁকে

দেখে রাসূল সাঃ কে ওয়াহশির আগমনের খবর দিলে তিনি বললেন, "তাকে কিছু বলো না। এক হাজার কাফিরকে হত্যা করার তুলনায় একজন লোকের ইসলাম কবুল করা আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়"। এরপর রাসূল সাঃ তার কাছে হামযা রাঃ কে শহীদ করার ঘটনা আদ্যপান্ত শুনলেন এবং বললেন, "যদি তোমার পক্ষে সম্ভব হয় তাহলে আমার সামনে আর এসো না। কারণ, তোমাকে দেখামাত্র আমার অন্তরে চাচার জন্য নতুনভাবে কষ্ট উদয় হয়"। এরপর থেকে সে রাসূল সাঃ এর মজলিসে সর্বদা রাসূল সাঃ এর পিঠের পেছনে বসত। পরবর্তীতে ইয়ামামার যুদ্ধে মুসায়লামা কাযযাবকে ঐ একই বর্শা দিয়ে ওয়াহশি হত্যা করে।

## উহুদযুদ্ধের শহীদগণ ও হামরাউল আসাদ অভিযান

### শহীদগণের দাফন:

উহুদের যুদ্ধের পর রাসুলুল্লাহ ﷺ শহীদদের মৃতদেহ পরিদর্শন করেন এবং বলেন, "আমি এই লোকদের ব্যাপারে সাক্ষী থাকব। যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে আহত হয়, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন এই অবস্থায় উঠাবেন যে তার ক্ষতস্থান দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হবে। এর রং রক্তের মতো হলেও ঘ্রাণ হবে মেশকের মতো।" এরপর, শহীদদের দাফন করার জন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দেন যে তাঁদের মদিনায় না নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রেই দাফন করা হোক এবং গোসল ছাড়াই তাঁদের পরনের কাপড়ে দাফন করা হোক। শহীদদের দেহ থেকে অস্ত্র ও হাতিয়ার সরিয়ে নিতেন এবং সাধারণত দুজন শহীদকে একই কবরে দাফন করা হতো। যাদের মধ্যে কুরআন বেশি মুখস্ত ছিল, তাদের আগে কবরে রাখা হতো।

আবার,আব্দুল্লাহ ইবনু হারাম এবং আমর ইবনু জামুহ, যাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল, তাঁদের একসঙ্গে একই কবরে দাফন করা হয়। হামজা ইবনু আবদুল মুত্তালিব (রা.) এর মৃতদেহ মুশরিকরা বিকৃত করে। তাঁর বোন সাফিয়া (রা.) ভাইয়ের মৃতদেহ দেখতে চান, রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রথমে তাঁকে নিষেধ করেন। কিন্তু সাফিয়া (রা.) ধৈর্য ধারণ করেন এবং হামজার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। হামজাকে আব্দুল্লাহ ইবনু জাহশের সঙ্গে দাফন করা হয়, যিনি তাঁর ভাগিনা এবং দুধ ভাই ছিলেন।

হামজার (রা.)জন্য কাফনের কাপড়ের অভাব ছিল এবং তাঁর জন্য একটি কালো চাদর ছাড়া কিছু পাওয়া যায়নি। এভাবে, মাথা চাদর দিয়ে ঢেকে পায়ে ইযখির (এক প্রকার ঘাস) চাপিয়ে দেওয়া হয়। একই অবস্থা ছিল মুসআব ইবনু উমাইর (রা.) এরও, যাঁর জন্য শুধুমাত্র একটি চাদর পাওয়া গিয়েছিল। হানজালা ইবনু আবি আমির (রা.) এর মৃতদেহ এক অদ্ভুত অবস্থায় ছিল। তাঁর দেহ জমিন থেকে উপরে অবস্থান করছিল এবং সেখান থেকে পানি পড়ছিল, কারণ তিনি যুদ্ধে যাওয়ার সময় গোসল ফরজ অবস্থায় ছিলেন। এজন্য ফেরেশতারা তাঁকে গোসল

করিয়ে দেন, এবং হানজালা "গসীলুল মালায়িকাহ" (ফেরেশতাদের দ্বারা গোসলকৃত) নামে পরিচিত হন।

## শহীদ ও কাফিরদের নিহতের সংখ্যা:

অধিকাংশ বর্ণনাকারীর মতে মুসলিম শহীদদের সংখ্যা ছিল ৭০ জন। এদের মধ্যে ৪১ জন ছিলেন খাযরাজ গোত্রের, ২৪ জনের আউস গোত্রের, চারজন ছিলেন মুহাজির এবং একজন ইহুদী ছিল। আর কুরাইশদের নিহতদের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ আছে। ইবনে ইসহাকের মতে, কুরাইশদের নিহতের সংখ্যা ছিল বাইশজন। তবে বিভিন্ন বর্ণনা ও সিরাতের কিতাবাদি লক্ষ করলে মনে হয় এই সংখ্যা ৩৭ জন। এ ব্যাপারে আল্লাহই ভাল জানেন।

## গাযওয়ায়ে হামরাউল আসাদ:

মুসলিম বাহিনী মদিনায় ফিরে আসার পরও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর গোয়েন্দা বাহিনী শত্রুদের কার্যক্রম মনিটরিং অব্যাহত রাখে। তাদের মাধ্যমে রাসূল ﷺ জানতে পারেন যে, আবু সুফিয়ান এবং কাফের বাহিনী রাওহা নামক স্থানে পৌঁছানোর পর তাদের মধ্যে এক ধরনের হতাশা ও উল্লাস দেখা গেছে। আবু সুফিয়ান তাদের বাহিনীকে বলছিলেন, 'তোমরা কিছুই করতে পারলে না, মোহাম্মদকে হত্যা করতে পারলে না, তাদের নারীদের দাসী বানাতে পারলে না।' তার এসব বক্তব্য শুনে রাসূল ﷺ উহুদ যুদ্ধের পরবর্তী দিনেই হামরাউল আসাদ অভিযান শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন।

উহুদ যুদ্ধে অংশ নেওয়া সাহাবীদের সাথে নিয়ে রাসূল ﷺ এই অভিযানে বের হন। উদ্দেশ্য ছিল কুরাইশদের ভয় দেখানো এবং তাদের মনে মুসলিম বাহিনীর শক্তির অভ্যন্তরীণ সাহসের ধারণা তৈরি করা। হামরাউল আসাদে পৌঁছে রাসূল ﷺ তিন দিন পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন, কিন্তু কাফের বাহিনী মুসলিম বাহিনীর মোকাবেলা করার সাহস দেখায়নি।

এদিকে, মা'বাদ ইবনে আবী মা'বাদ খুযাঈ, যিনি তখন মুশরিক ছিলেন, তার গোত্রের মুসলিম ও মুশরিকরা রাসূল ﷺ এর কাছে গোপনীয়তা রক্ষা করত এবং তিহামা অঞ্চলে ঘটে যাওয়া সব খবর পৌঁছাতো। একদিন মা'বাদ রাসূল ﷺ এর সঙ্গে দেখা করে উহুদের পরাজয়ের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং মুসলিমদের প্রতি শুভকামনা জানিয়ে বলেন, 'মোহাম্মদ বিপুলসংখ্যক মানুষের সঙ্গে তোমাদের দিকে চলে আসছে।' তার এই খবর শুনে আবু সুফিয়ান ও তার বাহিনী ভয় পেয়ে যায়। মা'বাদ তাদের আরও বলেন, 'মুসলিমরা এখন বিপুল সংখ্যায় যুদ্ধ প্রস্তুত করেছে, যারা আগে যুদ্ধ থেকে ফিরে গিয়েছিল তারা অনুতপ্ত হয়ে তাদের সাথে যোগ

দিয়েছে।' এ কথা শোনার পর আবু সুফিয়ান তার বাহিনীকে যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে যেতে পরামর্শ দেন।

তারপর আবু সুফিয়ান, মুসলিমদের ভয় দেখানোর জন্য একটি নতুন বুদ্ধি বের করেন। তিনি কবীলায়ে আব্দুল কায়েসের একটি কাফেলার সঙ্গে দেখা করে তাদেরকে মদিনা পাঠানোর জন্য বলেছিলেন, 'তোমরা মোহাম্মদকে বলবে যে, আমরা তার ওপর হামলা চালানোর পরিকল্পনা করেছি এবং তার অবশিষ্ট বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' এভাবে কাফেলার মাধ্যমে উকাষ বাজারে মুসলিমদের কাছে এই বার্তা পৌঁছানো হয়। তবে আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য আয়াত নাযিল করেন, যা তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর করে দেয়:

*"তাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, কতই না চমৎকার কামিয়াবীদানকারী।" (সূরা আলে ইমরান, ৩:১৭৩-১৭৪)*

অবশেষে, রাসূল ﷺ যখন দেখলেন যে শত্রুর মুখোমুখি হওয়ার আর কোনো সম্ভাবনা নেই, তখন তিনি মদিনায় ফিরে আসেন।

## আর রাজির মিশন ও বী'রে মা'উনার ট্রাজেডি

### আর রাজির মর্মান্তিক ঘটনা:

চতুর্থ হিজরির সফর মাসে আজল ও কারাহ গোত্রের কয়েকজন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ এর কাছে এসে জানায় যে, তাদের এলাকায় কিছু মানুষ ইসলামের চর্চা করছে। তারা রাসূল-কে অনুরোধ করে তাদের এলাকায় ইসলামের শিক্ষা দেওয়ার জন্য সাহাবীদের প্রেরণ করতে। রাসূলুল্লাহ ৬ জন বা মতান্তরে ১০ জন সাহাবীকে তাদের সঙ্গে প্রেরণ করেন। এই সাহাবীগণ যখন রাবেগ ও জেদ্দার মধ্যবর্তী রাজি নামক স্থানে পৌঁছান, তখন আজল ও কারাহ গোত্র বনু লাহইয়ান গোত্রকে সাহাবীদের উপর আক্রমণ চালানোর জন্য লেলিয়ে দেয়। বনু লাহইয়ানের ১০০ জন তীরন্দাজ সাহাবীদের উপর আক্রমণ করে।সাহাবীগণ পাহাড়ে আশ্রয় নিলে শত্রুরা তাদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং প্রতিশ্রুতি দেয় যে, নিচে নেমে এলে তাদের হত্যা করা হবে না। সাহাবীদের নেতা আসিম রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের প্রস্তাবে রাজি না হয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যান। কিন্তু অবিরাম তীর বর্ষণের ফলে ৭ জন সাহাবী সেখানে শহীদ হন। বাকি ৩ জন সাহাবী শত্রুদের প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করে নিচে নেমে আসেন। শত্রুরা সঙ্গে সঙ্গেই তাদের বেঁধে ফেলে। তাদের মধ্যে একজন সাহাবী বন্দি হতে অস্বীকৃতি জানালে তাকে হত্যা করা হয়।

খুবাইব ইবনে আদী এবং যায়দ ইবনে দাসীন্নাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুমকে বন্দি করে মক্কায় নিয়ে বিক্রি করা হয়। তারা বদরের যুদ্ধে কুরাইশের কিছু নেতাকে হত্যা করেছিলেন। খুবাইব রাযিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করার জন্য মক্কাবাসী হারাম শরীফের বাইরে তানঈমে নিয়ে যায়। মৃত্যুর আগে তিনি দু'রাকাত সালাত পড়ার অনুমতি চান। সালাত শেষে তিনি বলেন, "যদি তোমরা বলো যে আমি ভয় পেয়েছি, তবে আমি সালাত দীর্ঘ করতাম।" এরপর তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেন, "হে আল্লাহ, তাদের একে একে ধ্বংস করো এবং কাউকে অবশিষ্ট রেখো না।"

তাকে শূলে চড়ানোর আগে আবু সুফিয়ান জিজ্ঞেস করেন, "তুমি কি চাও যে, তোমার পরিবর্তে মুহাম্মদ এখানে থাকুক, আর তুমি বেঁচে যাও?" তিনি উত্তরে বলেন, "আল্লাহর শপথ! আমি এটা পছন্দ করি না যে, আমি বেঁচে থাকি এবং রাসূল এর গায়ে একটি কাটার আঘাতও লাগে।" এরপর তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। তার লাশ পাহারা দেওয়া হয়, কিন্তু সাহাবী আমর ইবনে উমাইয়্যা রাযিয়াল্লাহু আনহু সে তার লাশ দাফন করেন।গায়ে একটি কাটার আঘাতও লাগে।" এরপর তাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। তার লাশ পাহারা দেওয়া হয়, কিন্তু সাহাবী আমর ইবনে উমাইয়্যা রাযিয়াল্লাহু আনহু কৌশলে তার লাশ দাফন করেন।

কুরাইশরা বদরের যুদ্ধে তাদের এক নেতাকে হত্যার প্রতিশোধ নিতে আসিম রাযিয়াল্লাহু আনহুর লাশ আনার চেষ্টা করে। কিন্তু আসিম রাযিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন, "হে আল্লাহ! কোনো মুশরিক যেন আমার দেহ স্পর্শ করতে না পারে।" আল্লাহ তার দোয়া কবুল করেন। আল্লাহ একটি ভীমরুলের ঝাঁক পাঠান, যা তার দেহকে ঘিরে রাখে। কুরাইশরা তার লাশ স্পর্শ করতে সক্ষম হয়নি।

## বী'রে মা'উনার ট্রাজেডি:

যে মাসে রাজির মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড ঘটে সেই মাসেই ততোধিক বেদনাদায়ক ও অধিক মর্মান্তিক আরেকটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। আবু বারা আমের বিন মালিক নামক এক ব্যক্তি রাসূল সাঃ-এর সাথে দেখা করতে আসলেন। রাসূল সাঃ তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন না আবার পরিত্যাগও করলেন না। তিনি রাসূল সাঃ কে অনুরোধ করলেন, নজদবাসীদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য কিছু সাহাবীকে প্রেরণ করতে। রাসূল সাঃ সাহাবীদের ব্যাপারে আশঙ্কা করলে তিনি কথা দিলেন সাহাবিগণ তার আশ্রয়ে থাকবেন। এরপর রাসূল সাঃ তার ৪০ জন মতান্তরে ৭০ জন বিশিষ্ট সাহাবীকে আবু বারার সাথে পাঠালেন।

এই দলের নেতা নিযুক্ত করা হয় মুনযির বিন আমির রাঃ কে। তাঁর উপাধি ছিল- 'মু'নিক লিইয়ামৃত' অর্থাৎ 'মৃত্যুর জন্য স্বাধীনকৃত'। এই দলের সাহাবীগণ ছিলেন শীর্ষস্থানীয়। তারা দিনের বেলায় জঙ্গল থেকে জ্বালানি সংগ্রহ করে আহলে সুফফাদের জন্য খাদ্য কিনতেন। রাতের বেলা কুরআন শিক্ষা করতেন, শিক্ষা দিতেন এবং সারারাত আল্লাহর দরবারে সালাত কায়েম করতেন। এর মাধ্যমে তারা বীরে মাউনা নামক কুপের নিকটে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে শিবির স্থাপনের পর হারাম বিন মিলহানকে সাহাবীগন রাসূল সাঃ-এর পত্র পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমির বিন তুফাইলের কাছে চিঠি পাঠালেন। কিন্তু আমের সেই চিঠি ছুয়েও দেখলো না বরং হারাম বিন মিলহান রাঃ কে বর্শা দিয়ে আঘাত করে হত্যা করে ফেলল। এরপর আমির অবশিষ্ট সাহাবাদেরকে হত্যা করার জন্য তার গোত্রকে আহ্বান জানালো। কিন্তু তারা রাজি না হলে বনু সুলাইম গোত্রকে সে আহ্বান জানাল। বনু সুলাইমের উসাইয়্যা, রি'ল এবং যাকাওয়ান তার আহবানে সাড়া দিয়ে সাহাবীদেরকে সেখানেই শহীদ করে ফেলল। কেবলমাত্র জীবিত ছিলেন কা'ব ইবনে যায়দ ইবনে নাজ্জার রাঃ।

ঘটনাস্থলের আশপাশে আরো দুজন সাহাবি আমর বিন উমাইয়্যা যমরী রাঃ এবং মুনযির ইবনে উকবা ইবনে আমের রাঃ উট চরাচ্ছিলেন। তারা ঘটনাস্থলে পাখি ওড়াউড়ি করতে দেখে সেখানে গিয়ে পৌঁছেন এবং অন্যদের সাথে যুদ্ধ করতে শুরু করেন। যুদ্ধরত অবস্থায় মুনযি রাঃ শহীদ হয়ে যান আর আমর ইবনে উমাইয়্যা যমরী রাঃ বন্দি হন। তবে দুশমনেরা যখন জানতে পারে যে, মুযার গোত্রের সাথে আমর বিন উমাইয়্যার সম্পর্ক রয়েছে তখন আমির বিন তুফায়েল তাঁর কপালের চুল কেটে দিয়ে তার মায়ের পক্ষ থেকে তাকে আযাদ করে দেয়। তার মায়ের উপর উপর একটি দাসকে স্বাধীন করার মানত ছিল।

পথে আমর বিন উমাইয়্যা দুইজন ব্যক্তিকে হত্যা করে, যারা রাসুলুল্লাহ ﷺ এর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা প্রাপ্ত ছিল। তিনি তাদের হত্যা করেছিল এই কথা চিন্তা করে যে, সাহাবীদের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করলেন। এ ঘটনা শুনার পর রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, ‘তুমি এমন দুইজন ব্যক্তিকে হত্যা করেছো, যার জন্য আমাকে খেসারত দিতে হবে।’

এই ঘটনা দুটিতে রাসূলকে সাঃ এতই ব্যথিত করেছেন যে, তিনি ফজরের সালাতে রি'ল, যাকাওয়ান, লাহইয়ান ও উসাইয়্যা গোত্রের বিরুদ্ধে একমাস যাবত কুনুতে নাজেলা পাঠ করতে থাকে।

# বনু নাযীরের বিরুদ্ধে অভিযান

কয়েকজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে রাসূল সাঃ ইহুদিদের কাছে গিয়ে বনু কিলাব গোত্রের সেই দুই ব্যক্তির রক্তপণ সম্পর্কে কথা বলছিলেন যাদেরকে আমির ইবনে উমাইয়্যা যামরী ভুলক্রমে হত্যা করেছিলেন। তারা রাসলু সাঃ কে একটি স্থানে বসে থাকতে বললেন এবং রাসূল সাঃ এর প্রয়োজন পূরণের ওয়াদা করলেন। রাসূল সাঃ দেওয়ালের সঙ্গে পিঠ লাগিয়ে বসে পড়লেন এবং তাদের ওয়াদা পূরণের অপেক্ষায় রইলেন। এসময় রাসূল সাঃ এর সাথে ছিলেন আবু বকর, উমর, আলী রাঃ এবং আরো কয়েকজনবিশিষ্ট সাহাবী।

ইহুদীরা এই সুযোগে রাসুল সাঃ কে হত্যা করার জন্য পরস্পর আলাপ-আলোচনা করতে লাগল। অবশেষে আমর বিন জিহাশ বলল, 'মুহাম্মাদের মাথার উপর জাঁতাটি নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করতে রাজি আছি'। তাদের মধ্য থেকে সাল্লাম ইবনে মিশকাম বলল, 'তোমরা এমন কাজ করো না। কারণ আল্লাহর কসম, তোমরা যা করতে চাচ্ছো তা তাকে জানিয়ে দেওয়া হবে। তাছাড়া আমাদের ও তাদের মধ্যে যে অঙ্গীকারনামা আছে এই কাজ হবে তার বিপরীত'। কিন্তু তার কথায় কেউ কর্ণপাত করলো না এবং তাদের চক্রান্ত বাস্তবায়নে অগ্রসর হল। জিবরীল আঃ আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল সাঃ এর কাছে এসে তাদের ষড়যন্ত্রের কথা জানিয়ে দিলেন। রাসূল সাঃ সেখান থেকে কোন কথা না বলে দ্রুত মদিনা অভিমুখে রওনা দিলেন। সাহাবীগণ তার সঙ্গে পরে এসে মিলিত হয়ে তার এমন প্রস্থানের কারণ জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, "তারা এক ভয়ংকর চক্রান্ত করেছিল কিন্তু আল্লাহ আমাকে সে বিষয়ে অবগত করেছেন"। মদিনায় ফিরে রাসূল সাঃ মুহাম্মাদ বিন মাসলামা রাঃ কে নির্দেশ দিলেন, ইহুদিদের কাছে এই নির্দেশ পৌছে দিতে তারা যেন ১০ দিনের মধ্যে মদিনা ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। ১০ দিন পর তাদের যাকেই মদিনায় পাওয়া যাবে তার শিরচ্ছেদ করা হবে। এই নির্দেশ পাওয়ার পর তারা মদিনা ছেড়ে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করল। কিন্তু মুনাফিক নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই ইবনে সালুলের পরামর্শক্রমে এবং তার বাধা দেওয়ার কারণে ইহুদিরা বেকে বসলো।

রাসুলের ঘোষিত ১০ দিন অতিবাহিত হয়ে গেলেও বনু নাজির তাদের বাসস্থান ত্যাগ না করায় মুসলিমবাহিনী এগিয়ে গিয়ে ১৫ দিন যাবৎ তাদের অবরুদ্ধ করে রাখে। রাসুল তাদের খেজুরগাছগুলো জ্বালিয়ে দিতে সাহাবিদের আদেশ দেন। এসব খেজুরের অর্থনৈতিক ভরসায় তারা যুদ্ধসরঞ্জাম সংগ্রহ করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সাহস দেখাচ্ছিল। রাসুলের এই ধরনের কর্মপরিকল্পনায় তাদের সামরিক শক্তি দুর্বল হতে থাকে। তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে ও চিৎকার করে বলতে থাকে, 'হে মুহাম্মাদ, আপনি পৃথিবীতে অনিষ্ট করতে নিষেধ

করেন, অনিষ্টকারী ব্যক্তিদের দোষী সাব্যস্ত করেন-খেজুরগাছ কেটে ফেলা কি অনিষ্ট তৈরি নয়?'

রাসুল কাছে নিরাপদে দেশ ত্যাগের আবেদন করে ইহুদীরা। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নবীজি ﷺ বলেন, 'তোমরা মদিনা থেকে বেরিয়ে যাও। বেরিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তোমরা প্রাণের নিরাপত্তা পাবে, তোমাদের উটগুলো যে পরিমাণ সম্পদ বহন করে নিতে পারে, তা তোমরা নিয়ে যেতে পারবে। অবশ্য অস্ত্র নিতে পারবে না।' ইয়াহুদিরা এতে সম্মত হয়। ৬০০ উট বোঝাই করে নিজেদের সম্পদ ইত্যাদি নিয়ে ইয়াহুদিরা জন্মভূমি ত্যাগ করে।"

## বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ ও ইফকের ঘটনা

### বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ:

সমসাময়িক আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযান ছিল খুযাআ গোত্রের বিরুদ্ধে সংঘটিত বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ। কুরাইশদের মিত্র এই গোত্রটির অবস্থান ছিল কৌশলগত বিবেচনায় বেশ গুরুত্বপূর্ণ। মক্কার কুরাইশদের সাথে যদি বোঝাপড়া করতে হয়, তবে খুযাআ গোত্রের সাথে আগে বোঝাপড়া করে নিতে হবে মদীনা আক্রমণের ব্যাপারে তাদের পরিকল্পনার নিশ্চিত খবর পেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ সাতশো মুজাহিদ নিয়ে তাদের অতর্কিতে আক্রমণ করে বসেন। যে জায়গাটিতে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তার নাম আল-মুরাইসী।

মুসলিমদের অতর্কিত হামলায় প্রতিরোধ গড়ার কোনো সুযোগও তারা পায়নি। উপরন্তু তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়, স্ত্রী-সন্তানদের বন্দী করে দাস হিসেবে নিয়ে আসা হয়।

সাধারণত, মুসলিমবাহিনী শত্রুদের উপর আক্রমণ করার আগে ইসলাম গ্রহণের জন্য তিনদিন সময় দিয়ে থাকে। তাদের বলা হয় মুসলিম হও, না হলে জিযিয়া দাও, আর এ দুটো প্রস্তাবের কোনোটাতেই রাজি না হলে মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করো। কিন্তু বনু মুস্তালিককে এক মুহূর্তের জন্যও সময় দেওয়া হয়নি কারণ তাদের কাছে আগেই দাওয়াহ পৌঁছে গিয়েছিল। তারা আরবেই বসবাস করতো, ইসলাম সম্পর্কেও জানতো। জেনে শুনেই তারা কুরাইশদের পক্ষ নিয়েছিল। আবদুল্লাহ ইবন উমার রা. বলেন, বনু মুস্তালিককে অসতর্ক অবস্থায় আক্রমণ করা হয়। তারা তখন পশুদের পানি খাওয়ানোতে ব্যস্ত ছিল।

## ইফকের ঘটনা:

বনু মুস্তালিকের অভিযান শেষে রাসুলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবিদের কাফেলা মদীনায় ফিরে যাচ্ছিল। মা আয়িশা (রা.)-ও নবীজি ﷺ-এর সঙ্গে ছিলেন। একসময় কাফেলা থামলে মা আয়িশা (রা.) প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে বাইরে যান। ফিরে আসার সময় তাঁর হারিয়ে যাওয়া হার খুঁজতে সময় লেগে যায়। ততক্ষণে কাফেলা তাঁকে না বুঝে রওনা হয়ে যায়।

মা আয়িশা (রা.) কাফেলায় ফিরতে না পেরে যেখানে ছিলেন সেখানেই বসে থাকলেন, যাতে কেউ তাঁকে খুঁজে পায়। তখন সাহাবি সাফওয়ান ইবন মুআত্তিল (রা.) পেছনে থেকে আসছিলেন। তিনি মা আয়িশা (রা.)-কে দেখে চিনলেন এবং কোনো কথা না বলে তাঁর উট নিয়ে এসে মা আয়িশা (রা.)-কে তাতে উঠিয়ে কাফেলার দিকে রওনা দিলেন।

কাফেলায় ফিরে আসার পর মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবন উবাই এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অপবাদ ছড়ায়। সে বলল, মা আয়িশা (রা.) এবং সাফওয়ান (রা.) কিছু অবৈধ কাজে লিপ্ত ছিলেন। মুনাফিকদের চক্রান্তে মদীনায় গুজব ছড়িয়ে পড়ে। এমনকি কিছু মুসলমানও এ গুজবে জড়িয়ে পড়েন।

মা আয়িশা (রা.) এ সময় অসুস্থ ছিলেন এবং পুরো ঘটনার কিছুই জানতেন না। নবীজি ﷺ-এর আচরণে কিছু পরিবর্তন দেখে তিনি ব্যথিত হন। পরে অপবাদের খবর শুনে অত্যন্ত দুঃখ পান এবং নিজের ঘরে থেকে আল্লাহর ওপর ভরসা রাখেন। তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যেতে চাইলেন না এবং দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে কেবল আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করলেন।

এই দীর্ঘ অপেক্ষার সময়ে নবীজি ﷺ সাহাবাদের সঙ্গে পরামর্শ করেন এবং মসজিদে বক্তৃতা দিয়ে অপবাদ রটনাকারীদের সতর্ক করেন। পরে আল্লাহ তায়ালা ওহী নাজিল করেন (সূরা নূর, আয়াত ১১-২০), যেখানে মা আয়িশা (রা.)-এর নির্দোষিতা ঘোষণা করা হয়। এই ঘটনায় মুনাফিকদের চক্রান্ত প্রকাশিত হয় এবং যারা অপবাদে অংশ নিয়েছিল তাদের শাস্তি দেওয়া হয়।

# খন্দকযুদ্ধ: প্রেক্ষাপট ও প্রস্তুতি

৫ম হিজরির শাওয়াল মাসে খন্দকযুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেই যে বনু নাযির গোত্রকে মদিনা থেকে বের করে দেওয়া হলো তারপর তারা খাইবারে আশ্রয় নেয়। সেখানে এসে তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। পরিকল্পনা করতে থাকে একটি আঞ্চলিক জোট গঠন করার। তারা এতে সফলও হয়। তারা কুরাইশ, গাতফান ও তাদের আরও কিছু মিত্রশক্তি একটি সম্মিলিত সামরিক জোট গঠন করে। তাদের সব শক্তি একত্র করে একযোগে মদিনা আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেয়। ১০ হাজার লোকের সমন্বয়ে গঠিত বিশাল সশস্ত্রবাহিনী পৃথিবীর বুক থেকে মুসলিমদের চিরতরে উচ্ছেদের লক্ষ্যে মদিনার দিকে এগোয়।

রাসূল ﷺ যখন তাদের এগিয়ে আসার সংবাদ অবগত হন, তখন সাহাবিদের সঙ্গে পরামর্শসভা ডাকেন। সব শুনে সালমান ফারসি রা. তখন খোলা ময়দানে বেরিয়ে যুদ্ধ করা সমীচীন হবে না বলে মত প্রকাশ করেন; বরং যেদিক থেকে শত্রুদের মদিনায় প্রবেশের আশঙ্কা রয়েছে, সেদিকে পরিখা খননের পরামর্শ দেন। তাঁর এই পরামর্শ গৃহীত হয়। পরামর্শ অনুযায়ী রাসুল ﷺ সাহাবিদের সঙ্গে নিয়ে পরিখা খননে লেগে যান। সাহাবিদের ১০ জনে ছোট ছোট দলে ভাগ করে দিলেন। মাত্র ছয় দিনে পাঁচ গজ গভীর পরিখার কাজ সমাপ্ত হয়। খননকাজে খোদ রাসুলও ﷺ অংশ নেন।

পরিখা খননের সময় একবার বিশাল আকৃতির একটি পাথরখণ্ড বের হয়। এটি সরাতে সবাই ব্যর্থ হলে রাসুল ﷺ তাঁর পবিত্র হাত দিয়ে পাথরটিতে এমন এক আঘাত করেন যে, সেটি খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যায়। এভাবেই পরিখা খনন করা হয়।

এদিকে কাফিরদের সম্মিলিত বাহিনী এসে মদিনা অবরোধ করে ফেলে। ফলে মুসলমানরা প্রায় ১৫ দিন অবরুদ্ধ থাকেন। এ সময় ইয়াহুদিদের শেষ গোত্র বনু কুরায়জাও চুক্তি ভঙ্গ করে কাফিরদের সম্মিলিত বাহিনীর সঙ্গে যোগ দেয়।

সম্মিলিত বাহিনীর অবরোধ আর ভেতরে বনু কুরায়জার বিদ্রোহ চরম অস্থিতিশীল অবস্থার সৃষ্টি করে। রসদস্বল্পতার কারণে মুসলমানরা তিন দিন অনাহারে কাটান। সাহাবিরা এ সময় ক্ষুধায় অস্থির হয়ে নবিজিকে নিজেদের পেট উন্মুক্ত করে দেখান যে, সবাই পেটে পাথর বেঁধে রেখেছেন। তিনি তখন তাঁর পবিত্র উদর খুলে দেখান যে, তাতে দুটি পাথর বাঁধা রয়েছে।অবরোধকারীরা পরিখা পেরোতে না পেরে মুসলিমদের ওপর তির ও পাথর বর্ষণ করতে শুরু করে। উভয় পক্ষেই তখন অনবরত তির-বর্ষণ চলতে থাকে। অবস্থা এমন সংকটাপন্ন ও শ্বাসরুদ্ধকর ছিল যে, নবিজির চার ওয়াক্ত নামাজ কাজা হয়ে যায়।

## আল্লাহর পক্ষ হতে প্রথম সাহায্য:

নুয়াইম ইবনে মাসউদ ছিলেন গাতফান গোত্রের একজন প্রভাবশালী নেতা। তিনি মুসলিমদের নৈতিকতা ও আদর্শে মুগ্ধ হন এবং গোপনে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে আসেন। তিনি ইসলাম গ্রহণের পর বললেন:
"ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে যা করতে বলবেন, আমি করব। আমাকে কাজে লাগান।"
রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে কৌশলে শত্রুপক্ষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে নির্দেশ দিলেন।
নুয়াইম (রাঃ) খুব বিচক্ষণতার সাথে কুরাইশ ও বনু কুরাইজা গোত্রের মধ্যে অবিশ্বাস সৃষ্টি করলেন।

১) তিনি প্রথমে কুরাইশদের কাছে গিয়ে বললেন,
"বনু কুরাইজা তোমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। ওরা গোপনে মুসলিমদের সঙ্গে সমঝোতা করছে।"

২) এরপর বনু কুরাইজার কাছে গিয়ে বললেন,
"কুরাইশ ও গাতফান তোমাদের ছেড়ে পালিয়ে যেতে পারে। মুসলিমরা যদি জয়লাভ করে, তবে তোমরা সমস্যায় পড়বে। সুতরাং, তোমরা আগে কুরাইশদের থেকে কিছু জিম্মি নিয়ে নাও

নুয়াইম (রাঃ)-এর কথার প্রভাবে কুরাইশ ও বনু কুরাইজা পরস্পরের প্রতি সন্দিহান হয়ে পড়ল। বনু কুরাইজা কুরাইশদের কাছে কিছু লোক জিম্মি চাইল। এতে কুরাইশ আরও সন্দেহ করল এবং তাদের মধ্যে বিভক্তি তৈরি হলো। এ বিভক্তি শত্রুপক্ষের মনোবল ভেঙে দেয় এবং তাদের আক্রমণ করার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়।

## আল্লাহর পক্ষ হতে দ্বিতীয় সাহায্য:

অবশেষে সাজসরঞ্জামহীন মুসলিমবাহিনীর তরে মহান আল্লাহর সাহায্য আসে। কাফিরদের ওপর এমন ঝড়োহাওয়া বয়ে যায় যে, তাদের তাঁবুর খুঁটি পর্যন্ত উড়ে যায় এবং চুলায় থাকা ডেগ-ডেকচি উলটে পড়ে। এই ঝড়োহাওয়া কাফিরদের হতবুদ্ধি করে দেয়। অন্যদিকে তাদের রসদও ফুরিয়ে এসেছিল। এ সময় নুয়াইম ইবনু মাসউদ রা. এমন এক কৌশল অবলম্বন করেন। অল্পসময়ে নিদারুণ পরাজয়ের দাগ নিয়ে যুদ্ধের ময়দান খালি করে তারা ফিরে যায়।

## হুদায়বিয়ার সন্ধি

ষষ্ঠ হিজরির জিলকদে রাসুল ﷺ উমরা করার নিয়তে ইহরাম বাঁধেন। তাঁর সঙ্গে ১৪ বা ১৫ শত সাহাবির বিরাট জামাআত মক্কা অভিমুখে রওনা হয়। হুদায়বিয়া মক্কা থেকে এক মঞ্জিল দূরে একটি কূপের নাম; এর নামানুসারেই এলাকার নামও হুদায়বিয়া। রাসুল এখানে যাত্রাবিরতি করেন।

সেখানে একটি কূপ একেবারে শুকনো ছিল। নবিজির মুজিজায় সেটি পানিতে ভরে ওঠে। হুদায়বিয়ায় পৌঁছার পর তিনি উসমান রা.-কে কুরাইশদের এ মর্মে অবহিত করতে মক্কায় পাঠান যে, তিনি এবার শুধু বায়তুল্লাহ জিয়ারত ও উমরা পালনের জন্যই তাশরিফ এনেছেন, এ ছাড়া অন্য কোনো (রাজনৈতিক) উদ্দেশ্য তাঁর নেই।

উসমান রা. মক্কা পৌঁছাতেই কুরাইশ কাফিররা তাঁকে আটক করে ফেলে। এদিকে মুসলিমদের মধ্যে এ গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, কাফিররা তাঁকে হত্যা করেছে। নবিজির কাছে যখন এ সংবাদ আসে, তখন তিনি একটি গাছের নিচে বসে সাহাবিদের কাছ থেকে জিহাদের বায়আত নেন। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে এবং এটিকে বায়আতে রিদওয়ান বলা হয়।

পরে জানা যায়, উসমান-হত্যার খবরটি ছিল মিথ্যা; বরং কুরাইশরা মুসলিমদের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাবে আগ্রহ প্রকাশ করে এবং সন্ধির শর্তসমূহ চূড়ান্ত করতে সাহল ইবনু আমরকে পাঠায়। পরে নিম্নোক্ত শর্তগুলো চূড়ান্ত করে অঙ্গীকারপত্র লেখা হয় এবং ১০ বছরের জন্য উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধিচুক্তি হয়:

১) মুসলিমরা এবার উমরা না করেই ফিরে যাবেন।

২) আগামী বছর হজ করতে এসে মাত্র তিন দিন থেকে ফিরে যাবেন।

৩) অস্ত্রসজ্জিত হয়ে আসতে পারবেন না। তরবারি সঙ্গে রাখা যাবে, তবে তা কোষবদ্ধ থাকবে।

৪) মক্কা থেকে কোনো মুসলমানকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন না।

৫) কোনো মুসলমান যদি মক্কায় চলে আসতে চায়, তাকে বাধা দেওয়া যাবে না।

৬) যদি কেউ মদিনা চলে যায়, তাহলে নবিজি তাকে ফেরত পাঠাবেন।

৭) মদিনা থেকে কেউ মক্কায় চলে এলে কাফিররা তাকে ফেরত পাঠাবে না।

এসব শর্ত যদিও বাহ্যত মুসলিমদের বিরুদ্ধে এবং প্রকাশ্যভাবে পরাজয় ও বৈষম্যমূলক ছিল; কিন্তু মহান আল্লাহ কুরআনে একে 'মহা বিজয়' বলে অভিহিত করেন। সাহাবিগণ এভাবে নতজানু হয়ে সন্ধি করাকে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিলেন না। নবিজি তাঁদের মনোভাব বুঝতে পেরে বলেন, 'আমার প্রতি এটাই মহান আল্লাহর নির্দেশ এবং এতেই আমাদের ভবিষ্যৎ-কল্যাণ নিহিত।'

পরবর্তীকালের ঘটনাসমূহ এ রহস্যের সমাধান করে দেয়- যেমন: সন্ধির কল্যাণে শান্তি ও পূর্ণ নিরাপত্তার সঙ্গে মক্কা-মদিনার মধ্যে যাতায়াত শুরু হয়। কাফিররা নবিজির খিদমতে এবং মুসলিমদের কাছে বিনা বাধায় আসা-যাওয়া করতে থাকে। এদিকে ইসলামি চরিত্রের চুম্বক শক্তি কাফিরদের দারুণভাবে আকৃষ্ট করতে শুরু করে।

ইতিহাসবিদরা বলেন, এ সময় এত অধিক পরিমাণ লোক ইসলামগ্রহণ করে, ইতিপূর্বে কখনো এমন হয়নি। প্রকৃতপক্ষে এ সন্ধি ছিল মক্কা-বিজয়েরই ভূমিকা।

## বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে চিঠি

হুদায়বিয়ার সন্ধির ফলে দাওয়াতের পথ মসৃণ হয়। তখন রাসুল সত্যের এই আহ্বান গোটা দুনিয়ার শাসকদের কাছে পৌঁছে দিতে মনস্থ করেন। সুতরাং এ উদ্দেশ্যে আমর ইবনু উমাইয়াকে হাবশার বাদশাহ আসহামা নাজাশির কাছে পাঠান। আসহামা নবিজির চিঠিটি তাঁর উভয় চোখে রেখে সিংহাসন থেকে নিচে নেমে মাটিতে বসে পড়েন এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসলামগ্রহণ করেন। রাসুল এর যুগেই তিনি ইনতিকাল করেন।

দাহইয়া কালবি রা.-কে রোম-সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে পাঠান। রাসুল যে সত্য নবি, তা তিনি অকাট্য প্রমাণাদি ও অতীতের আসমানি গ্রন্থসমূহের মাধ্যমে স্পষ্টতবে তা জানতে পেরেছিলেন। তখন সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইসলামগ্রহণের ইচ্ছা করেন; কিন্তু এতে তার সকল প্রজা খেপে যায়। তাই তিনি এই চিন্তায় ভীষণ ভয় পেয়ে যান যে, আমি যদি ইসলামগ্রহণ করি, এরা আমাকে সিংহাসনচ্যুত করবে। এ জন্য তিনি ইসলাম গ্রহণ করা থেকে সে বিরত থাকেন।

আব্দুল্লাহ ইবনু হুজায়ফা রা.-কে পারস্যের সম্রাট খসরু পারভেজের কাছে পাঠান। এই হতভাগা নবিজির চিঠির সঙ্গে অত্যন্ত ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ করে এবং চিঠিটি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে। নবিজির কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি তার জন্য বদদুআ করেন-'আল্লাহ তার সাম্রাজ্যকে এমনভাবে টুকরো টুকরো করে দিন, যেভাবে সে আমার চিঠিটি টুকরো টুকরো করেছে।' নবিজির দুআ বিফলে যায়নি। কিছুদিন পরই খসরু পারভেজ তার পুত্র শিরওয়াহর হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়।

এ ছাড়া হাতিব ইবনু আবি বালতাআ রা.-কে মিসর ও আলেকজান্দ্রিয়ার বাদশাহ মুকাওকিসের কাছে পাঠান। আল্লাহ তাঁর অন্তরে ইসলামের সত্যতা ও মহানবি সম্পর্কে বিশ্বাস ঢেলে দিয়েছিলেন। ফলে বাদশাহ মুকাওকিস হাতিব ইবনু আবি বালতাআর সঙ্গে অত্যন্ত উত্তম আচরণ করেন এবং নবিজির জন্য কিছু উপহারও পাঠান। এর মধ্যে মারিয়া কিবতিয়া নামের একজন দাসী এবং দুলদুল নামে সাদা রঙের একটি খচ্চরও ছিল। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, ১ হাজার স্বর্ণমুদ্রা আর একজোড়া কাপড়ও ছিল।

আমর ইবনুল আস রা.-কে চিঠিসহ আম্মানের বাদশাহ জাইফার ও আবদুল্লাহর কাছে ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পাঠান। তাঁদের উভয়ের অন্তরেও ব্যক্তিগত অনুসন্ধান আর আসমানি কিতাবাদির মাধ্যমে নবিজির সত্য নবি হওয়া সম্পর্কে বিশ্বাস জন্মে। পরে তাঁরা উভয়ে মুসলমান হন। তখন থেকেই তাঁরা তাঁদের প্রজাদের কাছ থেকে জাকাত সংগ্রহ করতে থাকেন এবং আমর ইবনুল আসের হাতে জাকাতের সেসব সম্পদ অর্পণ করেন।

## খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ও আমর ইবনুল আসের ইসলামগ্রহণ:

খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা. তখন পর্যন্ত প্রতিটি যুদ্ধে মুসলিমদের বিরুদ্ধে অসাধারণ রণনৈপুণ্য দেখিয়ে আসছিলেন। অধিকাংশ যুদ্ধে, বিশেষত উহুদযুদ্ধে তাঁর কারণেই কাফিরদের পিচ্ছিল পা দৃঢ় হয়েছিল। তবে হুদায়বিয়ার সন্ধির পর তিনি নিজ থেকেই ইসলামগ্রহণের জন্য মক্কা থেকে মদিনার পথে রওনা দেন। পথিমধ্যে আমর ইবনুল আসের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হয়। তখন তিনি জানতে পারেন, আমরও ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে সফর করছেন। এরপর তাঁরা উভয়ে একসঙ্গে মদিনায় নবিজির খিদমতে এসে ইসলামগ্রহণ করেন।

## খাইবার যুদ্ধের কারণ ও প্রেক্ষাপট

মদিনার ইয়াহুদিদের মধ্যে বনু নাজির সম্প্রদায় যখন খায়বারে গিয়ে বসতি স্থাপন করে, তখন খায়বার ইয়াহুদিদের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়। সেখান থেকেই তারা পুরো আরবের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকদের ইসলামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করত।

তাদের শায়েস্তা করতে সপ্তম হিজরির মুহাররাম বা জুমাদাল উলা মাসে রাসুল ﷺ ৪০০ পদাতিক এবং ২০০ অশ্বারোহী সেনার বাহিনী নিয়ে তাদের মোকাবিলার জন্য খায়বারে উপস্থিত হন। উভয় বাহিনীর মধ্যে তুমুল লড়াই এবং ব্যাপক হতাহত হয়। শেষপর্যন্ত আল্লাহ তাআলা মুসলিমদের বিজয় দান করেন এবং ইয়াহুদিদের সব দুর্গ তখন মুসলিমদের হাতে চলে আসে।

খায়বারের এই যুদ্ধে আলি রা. বিশেষ রণনৈপুণ্য দেখান। তিনি একাই হাত দিয়ে খায়বারের দুর্গফটক উপড়ে ফেলে দেন; অথচ ফটকটি একসঙ্গে ৭০ জন লোকও নাড়াতে পারত না। কোনো কোনো বর্ণনায় রয়েছে যে, আলি রা. যুদ্ধে এই ফটকটি হাতের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

## কাযা উমরা আদায়:

গত বছর (ষষ্ঠ হিজরির জিলকদ মাসে) হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় যে উমরা আদায় করা সম্ভব হয়নি এবং কুরাইশ কাফিরদের সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল যে, 'মুসলিমরা আগামী বছর উমরা আদায় করবে এবং তিন দিনের বেশি সময় মক্কায় থাকবেন না।' এ বছর সেই প্রতিশ্রুতি ও চুক্তি অনুযায়ী রাসুল তাঁর সাহাবিদের নিয়ে মক্কায় উপস্থিত হন এবং চুক্তির সব শর্ত মেনে উমরা পালন শেষে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

## মুতার যুদ্ধ

## মুতার যুদ্ধের পটভূমি:

মুতার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল রাসুলুল্লাহর ﷺ একজন দূতের হত্যার কারণে। রাসূল ﷺ তাঁর দূত, হারিস ইবনে উমাইরকে (রাঃ), সিরিয়ার বুসরা অঞ্চলে ইসলামের দাওয়াত দিতে পাঠিয়েছিল। পথে গাসসানি রাজ্যের নেতা শুরাহবিল বিন আমর তাকে হত্যা করে। দূত হত্যার এই ঘটনা আন্তর্জাতিক নিয়মের লঙ্ঘন ছিল। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) প্রতিশোধ নিতে ৩ হাজার সাহাবির একটি বাহিনী প্রেরণ করেন, যা মুতার যুদ্ধের সূচনা ঘটায়।

## মুসলিম বাহিনীর প্রস্তুতি:

রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ৩ হাজার সাহাবিকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেন এবং তিনজন সেনাপতি নিয়োগ দেন: যায়েদ ইবনে হারিসা (রাঃ), জাফর ইবনে আবি তালিব (রাঃ), এবং আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)। তিনি নির্দেশ দেন যে এক সেনাপতি শহীদ হলে অপরজন নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন। সৈন্যদের সিরিয়ার মুতার দিকে যাত্রার নির্দেশ দেওয়া হয়। এদিকে শত্রুপক্ষ রোমান বাহিনী এবং তাদের মিত্র গাসসানি খ্রিস্টানরা প্রায় ২ লক্ষ সৈন্য নিয়ে প্রস্তুত হয়।

## যুদ্ধক্ষেত্রে সংঘর্ষ:

মুতার এলাকায় মুসলিম বাহিনী শত্রুর বিশাল সৈন্যসংখ্যার মুখোমুখি হয়। যুদ্ধে প্রথমে নেতৃত্ব দেন যায়েদ ইবনে হারিসা (রাঃ)। তিনি সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করেন, কিন্তু শত্রুর আক্রমণে শহীদ হন। এরপর জাফর ইবনে আবি তালিব (রাঃ) পতাকা গ্রহণ করেন। তিনি অসম সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করেন। শত্রুরা তার দুটি হাত কেটে ফেললেও তিনি পতাকা বাহু দিয়ে ধরে রাখেন। অবশেষে তিনি ৯০টির বেশি আঘাতে শহীদ হন। এরপর আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং কিছুক্ষণ যুদ্ধ করার পর তিনিও শহীদ হন।

## খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ)-এর কৌশল:

তিনজন সেনাপতি শহীদ হওয়ার পর সাহাবিরা খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ)-কে নেতৃত্ব প্রদান করেন। তিনি দক্ষ কৌশল ব্যবহার করে মুসলিম বাহিনীকে রক্ষা করেন। তিনি রাতের বেলা সৈন্যদের অবস্থান পরিবর্তন করেন এবং দিনের আলোয় বিভিন্ন দলে বিভক্ত করেন, যাতে শত্রুরা বিভ্রান্ত হয় এবং মনে করে নতুন বাহিনী এসে যোগ দিয়েছে। তার এই কৌশলে রোমান বাহিনী আক্রমণ বন্ধ করে, এবং মুসলিম বাহিনী নিরাপদে ফিরে আসতে সক্ষম হয়।

## যুদ্ধের ফলাফল:

মুতার যুদ্ধে মুসলিমদের শহীদ সংখ্যা ছিল মাত্র ১২ জন, তবে রোমান বাহিনীর অনেক সৈন্য হতাহত হয়। যদিও এটি একটি কঠিন যুদ্ধ ছিল, মুসলিম বাহিনী অসাধারণ সাহসিকতা ও কৌশলের পরিচয় দেয়। এই যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। এটি মুসলিমদের জন্য সাহসিকতা ও আত্মত্যাগের উদাহরণ এবং পরবর্তীতে রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আরও বড় অভিযানের সূচনা হয়।

## মক্কাবিজয়: প্রেক্ষাপট ও অভিযান

হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্রে যেসব শর্ত লেখা ছিল, মুসলিমরা তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সেগুলো পূর্ণ নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করছিলেন। কিন্তু অষ্টম হিজরিতে কুরাইশরা সেই সন্ধি ভঙ্গ করে বসে। রাসুল সা. একজন দূত পাঠিয়ে চুক্তিনামা নবায়নের জন্য কুরাইশদের সামনে তখন কয়েকটি শর্ত দেন এবং শেষের দিকে লিখে দেন যে, এ শর্তগুলো তাদের মনঃপুত না হলে হুদাবিয়ার সন্ধি ভেঙে গেছে বলে মনে করতে হবে। ফলে কুরাইশরা সন্ধিভঙ্গের প্রস্তাবই গ্রহণ করে।

এরপর রাসুল (সা.) যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করেন এবং অষ্টম হিজরির ১০ রমজান মঙ্গলবার আসরের নামাজের পর ১০ হাজার সাহাবির বিশাল এক বাহিনী সঙ্গে নিয়ে মদিনা থেকে রওনা হন। তারপর 'কুদায়বিয়া' নামক স্থানে মাগরিবের সময় হলে সবাই সেখানে ইফতার করেন। মক্কার উপকণ্ঠে পৌঁছার পর খালিদ ইবনুল ওয়ালিদকে মুসলিমবাহিনীর একটি অংশসহ উপর দিকের রাস্তা দিয়ে মক্কায় প্রবেশের জন্য পাঠান। তাঁদের এটাও বলে দেন যে, 'কেউ তোমাদের সঙ্গে সংঘর্ষে না জড়ালে তোমরাও তরবারি উন্মুক্ত করবে না।'

এদিকে রাসূল ﷺ নিজে অপর প্রান্ত দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন এবং সাধারণ ঘোষণা দেন-'যে মসজিদে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ। যে আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে, সে-ও নিরাপদ। যে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখবে, সে-ও নিরাপদ।' অবশ্য তিনি ১১ জন পুরুষ আর চারজন মহিলার রক্ত ক্ষমা করেননি। কারণ, তাদের অস্তিত্বই ছিল যাবতীয় বিশৃঙ্খলার মূল। কিন্তু তারা সবাই এদিক-সেদিক ছড়িয়ে পড়ে। পরে তাদের অধিকাংশই মক্কাবিজয়ের পর মদিনায় পৌঁছে ইসলামগ্রহণ করে।

২০ রমজান শুক্রবার রাসূল ﷺ তাওয়াফ সম্পন্ন করেন। তখন পর্যন্ত কাবার আশপাশে ৩৬০টি মূর্তি যথারীতি বিদ্যমান ছিল। এ সময় নবিজির ﷺ হাতে একটি কাঠের টুকরো ছিল। তিনি যখন একটি মূর্তির পাশ দিয়ে যেতেন, তখনই কাঠ দ্বারা সেদিকে ইঙ্গিত করতেন আর মূর্তিটি মুখ থুবড়ে পড়ে যেত। তখন তাঁর পবিত্র মুখে উচ্চারিত হচ্ছিল,

*সত্য এসে গেছে আর মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, মিথ্যা তো বিলুপ্ত হওয়ারই। (সূরা বনি ইসরাইল: ৮১)*

## মক্কাবিজয়ের পর কুরাইশদের সঙ্গে মুসলিমদের আচরণ:

তাওয়াফ সমাপ্ত করে রাসুলী কাবা শরিফের চাবিরক্ষক উসমান ইবনু তালহার কাছ থেকে কাবার চাবি নিয়ে কাবার ভেতরে প্রবেশ করেন। সেখান থেকে বেরিয়ে মাকামে ইবরাহিমে নামাজ আদায় করেন। নামাজ শেষে তিনি মসজিদে তাশরিফ নেন। এদিকে লোকজন গভীর উৎকণ্ঠায় এ অপেক্ষা করছিল যে, রাসুল কুরাইশদের ব্যাপারে আজ কী নির্দেশ জারি করেন। কিন্তু সব দ্বিধা, সংশয় আর উৎকণ্ঠার অবসান ঘাটিয়ে বিশ্বনবি কুরাইশদের সম্বোধন করে বলেন, 'তোমারা সব দিক থেকে স্বাধীন ও নিরাপদ!' তারপর তিনি কাবাঘরের চাবিও তাদের হাতে ফেরত দিয়ে দেন।

## আবু সুফিয়ানের ইসলামগ্রহণ:

আবু সুফিয়ান-যিনি নবিজির বিরুদ্ধে কুরাইশদের সর্বাপেক্ষা বড় নেতা ছিলেন এবং তাদের পরিচালিত প্রায় সব যুদ্ধে তিনি প্রধান সেনাপতির ভূমিকা পালন করে আসছিলেন-মক্কাবিজয়ের প্রাক্কালে গোপনে মুসলিমবাহিনীর সংবাদ সংগ্রহ করতে তিনি মক্কা থেকে বেরোলে সাহাবিরা তাঁকে গ্রেপ্তার করেন। বন্দি অবস্থায় তাঁকে নবিজির ﷺ খিদমতে আনা হলে তিনি তাঁকে ক্ষমা করে দেন। নবিজির মহত্ত্ব ও উদারতার ফলে আবু সুফিয়ান তখনই কালিমা পড়ে মুসলমান হয়ে যান। ফলে আজ তাঁর নামের সঙ্গে 'রাদ্বিআল্লাহু আনহু' উচ্চারণ করা হয়।

মক্কাবিজয়ের দিন একব্যক্তি ভীত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে নবীজির দরবারে উপস্থিত হয়। নবীজি ﷺ তাকে বলেন, 'শান্ত হও, আমি কোনো রাজা-বাদশাহ নই, আমি তো একজন সাধারণ মায়ের সন্তান।'

মক্কাবিজয়ের পর ১৫ দিন রাসূল ﷺ সেখানে অবস্থান করেন। এ সময় মদিনার আনসাররা এ কথা ভেবে মনে কষ্ট পাচ্ছিলেন যে, এখন হয়তো রাসূল ﷺ মক্কায় থেকে যাবেন; আর আমরা তাঁর থেকে দূরে থেকে যাব। কিন্তু রাসূল যখন তাঁদের এই সংশয় আঁচ করতে পারেন, তখন বলেন, 'এখন তো আমার জীবন-মরণ তোমাদেরই সঙ্গে জড়িত।' এরপর রাসূল ﷺ আত্তাব ইবনু উসায়েদকে মক্কার গভর্নর মনোনীত করে মদিনার উদ্দেশ্য রওয়ানা হন।

## হুনাইনযুদ্ধের প্রেক্ষাপট

মক্কাবিজয়ের পর সাধারণভাবে আরবের লোকেরা বিপুলসংখ্যায় ইসলামগ্রহণ করতে থাকে। কেননা, তাঁদের মধ্যে এমন অনেক লোক ছিলেন, যাঁরা ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে নিঃশ্চিন্ত হওয়া সত্ত্বেও কুরাইশদের ভয়ে ইসলামগ্রহণে দেরি করছিলেন
এবং মক্কাবিজয়ের অপেক্ষায় ছিলেন। এখন তাঁদের সবাই দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করেন। বাকি আরবদের তখন এমন শক্তি বা সাহস ছিল না যে, তারা ইসলামের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। কিন্তু হাওয়াজিন ও সাকিফ গোত্র দুটি নিজেদের আত্মসম্মানবোধ থেকে মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য মক্কার দিকে এগোয়।

রাসূল ﷺ এ ব্যাপারে অবগত হয়ে ১২ হাজার সেনার এক বিশাল বাহিনী তাদের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত করেন। এঁদের মধ্যে ১০ হাজার ছিলেন আনসার ও মুহাজির, যাঁরা মক্কাবিজয়ের সময় মদিনা থেকে নবিজির সঙ্গে ছিলেন, আর ২ হাজার ছিলেন নওমুসলিম, যাঁরা মক্কাবিজয়ের সময় ইসলামগ্রহণ করেছিলেন। এ সংখ্যাটি তখন পর্যন্ত মুসলিমবাহিনীর সবচেয়ে বড় সংখ্যা ছিল।

অষ্টম হিজরির ৬ শাওয়াল আল্লাহর এ বাহিনী রওনা হয়। তাঁরা যখন হুনাইন প্রান্তরে পৌঁছান, তখন পাহাড়ের ঘাঁটিতে আত্মগোপনকারী শত্রুরা অতর্কিতভাবে তাদের ওপর হামলা চালিয়ে বসে। যেহেতু তখনো সেনাদের সারিবিন্যাসই সম্পন্ন হয়নি, তাই মুসলিমবাহিনীর সম্মুখভাগ পিছু হটা শুরু করে।

এই পিছু হটার বাহ্যিক কারণ সারিবিন্যাসের অপূর্ণতা আর মক্কার নওমুসলিমদের ভয় বলা হলেও প্রকৃত কারণের ইঙ্গিত পবিত্র কুরআনে এভাবে রয়েছে যে-অর্থাৎ, মুসলিমরা তখন নিজেদের চিরাচরিত অভ্যাসের বিপরীতে নিজেদের সংখ্যাধিক্য এবং সাজসরঞ্জাম দেখে গর্ববোধ করছিলেন। কোনো কোনো সাহাবি, এমনকি আবু বকর রা.-এর মতো ব্যক্তির মুখ থেকে এ ধরনের কথা উচ্চারিত হয়েছিল যে, 'আজ আমরা পরাজিত হতে পারি না।' এ জন্য আল্লাহ তাঁদের সতর্ক করতে এ ব্যবস্থা নেন, যেন মুসলিমরা বুঝতে পারেন, জয়-পরাজয় আমাদের হাতে নয় এবং এটা তির- তরবারির ওপরও নির্ভরশীল নয়। বদরযুদ্ধে নিরস্ত্র হওয়া সত্ত্বেও এত বড় বিজয়; আর হুনাইনযুদ্ধে এত বিপুল সাজসরঞ্জাম থাকা সত্ত্বেও প্রাথমিক পরাজয়ের এটাই সেই নিগূঢ় রহস্য।

রাসূল ﷺ তখন দুটি বর্ম পরে দুলদুলে বসা ছিলেন। নিজের বাহিনীকে পিছু হটতে দেখে তাঁর নির্দেশে আব্বাস রা. মুসলিমদের এক বীরত্বপূর্ণ আওয়াজ দ্বারা দৃঢ় থাকার আহ্বান জানান।

এতে নড়বড়ে ও টালমাটাল বাহিনী পুনরায় সুদৃঢ় হয়ে যায় এবং উভয় দলের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়।

এদিকে রাসুল একমুঠো মাটি নিয়ে শত্রুবাহিনীর ওপর নিক্ষেপ করেন। আল্লাহর কুদরতে এই একমুঠো মাটি শত্রুবাহিনীর প্রত্যেক সেনার চোখে গিয়ে পড়ে। এমনকি একটি সেনাও তা থেকে রক্ষা পায়নি। শেষপর্যন্ত শত্রুবাহিনী ভীত হয়ে পালায় এবং পরাজিত হয়। এই যুদ্ধে মুসলিমদের পক্ষে মাত্র চারজন এবং ৭০ জনের চেয়ে বেশি শত্রুসেনা নিয়ত হয়। মুসলমানরা তখন প্রতিশোধস্পৃহায় শিশু ও মহিলাদের প্রতি আক্রমণে উদ্যত হলে রাসূল ﷺ তাঁদের এ কাজ থেকে বিরত রাখেন।

## তায়েফযুদ্ধ

এরপর রাসূল ﷺ তায়েফের দিকে দৃষ্টি দেন। তায়েফ ছিল বনু সাকিফ ও বনু হাওয়াজিনের কেন্দ্র। প্রায় ২০ দিন তাদের অবরুদ্ধ রাখার পরও বিজয় অর্জিত হয়নি। ফলে অবরোধ তুলে ফেরার সময় জিইররানা নামক স্থানে যখন পৌঁছান, তখন তায়েফের হাওয়াজিনের একটি প্রতিনিধিদল নবিজির খিদমতে এসে আবেদন করে,হুনাইনযুদ্ধে মুসলিমদের হাতে তাদের যে-সকল লোক বন্দি রয়েছে, তাদের যেন মুক্তি দেওয়া হয়। নবীজি তাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে বন্দিদের মুক্ত করেন। এরপর তিনি যখন তায়েফ থেকে মদিনায় ফিরে আসেন, তখন তায়েফের একটি প্রতিনিধিদল তাঁর খিদমতে এসে ইসলামগ্রহণ করে।

## গাজওয়ায়ে তাবুক বা তাবুকযুদ্ধ

তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর নবম হিজরির মাঝামাঝি পর্যন্ত রাসূল ﷺ মদিনায় অবস্থান করেন। এ সময় তাঁর কাছে সংবাদ পৌঁছায় যে, মুতার যুদ্ধে পরাজিত রোমানরা পুনরায় মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য তাবুকে সেনাসমাবেশ করে যুদ্ধপ্রস্তুতি শুরু করেছে। রোমানদের রণপ্রস্তুতির সংবাদ পেয়ে রাসূল ﷺ ও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি শুরু করেন। কিন্তু সময়টা ছিল বেশ কঠিন। দুর্ভিক্ষের কারণে মুসলিমরা অভাব-অনটনে দিয়ে দিন পার করছিলেন। এ ছাড়া তখন প্রচণ্ড গরম ছিল। কিন্তু সাহাবিরা তো ছিলেন দীনের প্রতি আত্মোৎসর্গকারী মহান কাফেলা। তাঁরা এতসব বিপদের পরও দীনের সাহায্যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যান।

এবারই প্রথম যুদ্ধের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা হয়। নবীজির আবেদনে সাহাবিরা প্রাণ উজাড় করে অর্থসম্পদ দিয়ে সহযোগিতা করেন। আবু বকর রা. ঘরের সব জিনিসপত্র নবিজির খিদমতে পেশ করেন। উসমান রা. যুদ্ধ-তহবিলে বড় ধরনের সাহায্য করেন। তাতে ৯০০ উট এবং ১০০ ঘোড়া ছিল।

এরপর রজবের বৃহস্পতিবার ৩০ হাজার সাহাবির এক বিশাল কাফেলা নিয়ে রাসুল তাবুকের দিকে রওনা দেন।

## কয়েকটি মুজিজা:

ক) তাবুক যাওয়ার পথে নবিজি ﷺ আবু জার গিফারিকে দেখতে পান, তিনি একাকী পথ চলছেন। এটা দেখে তিনি ভবিষ্যদবাণী করেন, 'সে দুনিয়ায় একাকী চলবে, একাকী জীবন কাটাবে এবং একাকী মৃত্যুবরণ করবে।' বাস্তবেও তা-ই হয়েছিল ।

খ) এ যুদ্ধসফরেই নবিজির উটনী হারিয়ে যায়। তখন আল্লাহ তাআলা জিবরিলের মাধ্যমে তাঁকে জানিয়ে দেন যে, উটনীর লাগাম অমুক জায়গায় একটি গাছের সঙ্গে আটকে আছে। পরে সেখানে গিয়ে উটনীকে এ অবস্থায়ই পাওয়া যায়।

গ) মুসলমানগণ যখন তাবুকে পৌঁছান, তখন সেখানে গিয়ে কাউকে পাওয়া যায়নি। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস তার বাহিনী নিয়ে হিমসে চলে যায়। নবিজি তখন খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ রা.-কে উকাইদির নামের খ্রিষ্টান পাদরির কাছে পাঠান এবং ভবিষ্যদ্বাণী করেন, 'তোমরা রাতে তার সঙ্গে এমতাবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, সে তখন শিকারে ব্যস্ত থাকবে।' খালিদ সেখানে পৌঁছে তাকে এ অবস্থায়ই দেখতে পান এবং তাকে বন্দি করে নিয়ে আসেন।

নবিজি তাবুকে প্রায় ১৫-২০ দিন অবস্থান করেন; কিন্তু কেউ তাঁর মোকাবিলা করতে আসেনি। একপর্যায়ে বাধ্য হয়ে তিনি তাবুক থেকে ফিরে আসেন। এটাই ছিল নবিজির শেষ গাজওয়া বা যুদ্ধাভিযান। নবম হিজরির রমজানে তিনি বাহিনী নিয়ে মদিনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

## মসজিদে জিরারে অগ্নিসংযোগ:

তাবুক অভিযান থেকে ফেরার পর রাসূল ﷺ সে জায়গাটি আগুন লাগিয়ে ধ্বংসের নির্দেশ দেন, যেটি মুনাফিকরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে পরামর্শের জন্য তৈরি করেছিল এবং মুসলিমদের ধোঁকা দিতে এর নাম দিয়েছিল 'মসজিদ'।

এর মাধ্যমে এ বিষয়টি প্রমাণিত হয় যে, সেটি আদৌ কোনো মসজিদ ছিল না; বরং মুসলিমদের ক্ষতির উদ্দেশ্যেই নির্মাণ করা হয়েছিল।

## প্রতিনিধিদলের আগমন এবং দলে দলে লোকজনের ইসলামে প্রবেশ

হুদায়বিয়ার সন্ধির পর সর্বত্র যখন শান্তি ও নিরাপত্তা-পরিস্থিতি বিরাজ করে, সার্বিক পরিস্থিতি যখন অনুকূলে চলে আসে, তখন ইসলামের প্রচার-প্রসার আরও বিস্তৃত আঙ্গিকে শুরু হয়। এ জন্য হুদায়বিয়ার সন্ধিকে আসমানি দপ্তরে (আল্লাহর কাছে) বিজয় গণ্য করা হয়েছিল। কিন্তু এরপরও কিছু মানুষ কাফির কুরাইশদের ভয়ে ইসলামগ্রহণ করতে পারছিলেন না। তাঁদের জন্য মক্কাবিজয় সেই বাধাও দূর করে দেয়। ফলে তখন থেকেই সমগ্র আরবে পবিত্র কুরআন তার নিজের অলৌকিক ক্ষমতাবলে মানুষের অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে। এর অনিবার্য ফল দাঁড়ায়- একসময় যাঁরা ইসলাম ও মুসলিমদের চেহারাও দেখতে চাইতেন না, আজ তাঁরাই দলে দলে নবিজির খিদমতে আসতে থাকে এবং স্বেচ্ছায় ইসলামগ্রহণ করে নিজেদের জানমাল উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়ে যান। এসব প্রতিনিধিদলের অধিকাংশই নবম হিজরিতে নবিজির খিদমতে উপস্থিত হয়।

## বনু সাকিফের প্রতিনিধিদল:

তাবুকযুদ্ধের পর বনু সাকিফের প্রতিনিধিদল মদিনায় নবিজির খিদমতে এসে ইসলামগ্রহণ করে।

এরপর ধারাবহিকভাবে প্রতিনিধিদলের আগমন শুরু হয়। এসব প্রতিনিধিদলের সংখ্যা ৭০ পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়।তন্মধ্যে কয়েকটির বর্ণনা নিচে তুলে ধরা হলো:

## বনু ফাজারার প্রতিনিধিদল:

এই গোত্রের লোকেরা মদিনায় আসার আগেই ইসলামগ্রহণ করেন। এরপর তাঁরা প্রতিনিধিদল হিসেবে মদিনায় নবিজির খিদমতে উপস্থিত হন।

## বনু তামিমের প্রতিনিধিদল:

বনু তামিমের প্রতিনিধিদল নবিজির খিদমতে এসে কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর তাঁরা সবাই মুসলমান হয়ে যান।

## বনু সাআদ ইবনু বকরের প্রতিনিধিদল:

এই প্রতিনিধিদলের নেতা ছিলেন জিমাম ইবনু সালাবা। তিনি নবিজিকে বেশ কিছু প্রশ্ন করেন। রাসুল তাঁর সব প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দেন। ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত যাচাই-বাছাইয়ের পর তাঁর অন্তর থেকে যখন সব দ্বিধা-সন্দেহ দূর হয়ে যায়, তখন তিনি ইসলামগ্রহণ করেন। এরপর আপন গোত্রে ফিরে গিয়ে ইসলামের প্রচার করতে সভায় তাঁর গোত্রের সবাই মুসলমান হয়ে যান।

## বনু আবদুল কায়েসের প্রতিনিধিদল:

এই গোত্রের সবাই খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত ছিলেন। এরপর তাঁরা নবিজির খিদমতে এসে মুসলমান হন। তিনি এ সময় ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি তাঁদের শিক্ষা দেন।

## বনু হানিফের প্রতিনিধিদল:

এই গোত্রের প্রতিনিধিদল নবিজির খিদমতে এসে মুসলমান হয়। তাদের মধ্যে মুসায়লিমাও ছিল। সে পরবর্তী সময়ে নবুওয়াতের মিথ্যা দাবির কারণে 'মুসায়লিমাতুল কাজ্জাব' নামে কুখ্যাতি লাভ করে। আবু বকর রা.-এর খিলাফতকালে তার সকল অনুসারীসহ সাহাবিদের হাতে নিহত হয়।

## আবু বকরকে হজের আমির নির্ধারণ :

তাবুকযুদ্ধের পর নবম হিজরির জিলকদ মাসে নবীজি ﷺ আবু বকর রা.-কে হজের আমির নির্ধারণ করে মক্কায় পাঠান।

# হুজ্জাতুল ইসলাম বা বিদায়হজ

## রাসূলুল্লাহর ﷺ হজ্জ:

১০ হিজরির ২৫ জিলকদ মাসে রাসূল ﷺ হজ করতে মক্কার উদ্দেশে রওনা দেন। সাহাবিদের বিশাল জামাআত তাঁর সফরসঙ্গী হন, যাঁদের সংখ্যা ১ লাখের চেয়ে বেশি ছিল। মদিনা থেকে ছয় মাইল দূরে জুলহুলাইফায় তাঁরা হজের জন্য ইহরাম বাঁধেন। এরপর ৪ জিলহজ মক্কায় প্রবেশ করে হজের কার্যাবলি সম্পন্ন করেন।

## বিদায়হজের ভাষণ:

৯ জিলহজ রাসূল ﷺ আরাফাতের ঐতিহাসিক ময়দানে উপস্থিত হন এবং সবার উদ্দেশ্য এক  ভাষণ দেন, যা বিদায় হজ্জের ভাষণ নামে পরিচিত নবীজি ﷺ বলেন,

*লোকসকল, আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো, যাতে আমি তোমাদের জন্য প্রয়োজনীয় সব বিষয় বর্ণনা করতে পারি। আমি জানি না। আগামী বছর আমি তোমাদের সঙ্গে মিলতে পারব কি না।*

নবীজি আরও বলেন,

*মুসলিমদের জানমাল, ইজ্জত-সম্মান কিয়ামত পর্যন্ত এমনভাবে পবিত্র ও সম্মানিত, যেভাবে আজকের এ দিন (আরাফাতের দিন), এ মাস (জিলহজ মাস) এবং এ শহর (পবিত্র মক্কা) তোমাদের কাছে পবিত্র- সম্মানিত। এ জন্য কারও কাছে যদি অন্য কারও আমানত থেকে থাকে, তাহলে অবশ্যই সেটা আদায় করতে হবে।*

তিনি আরও বলেন,

*হে লোকেরা, তোমাদের স্ত্রীদের তোমাদের ওপর কিছু অধিকার রয়েছে, যেভাবে স্ত্রীদের ওপর তোমাদের কিছু আধিকার রয়েছে। সকল মুসলমান একে অপরের ভাই। কারও জন্য তার ভাইয়ের সম্পদ তার অনুমতি ছাড়া নেওয়া বৈধ নয়।*

*আমার পরে তোমরা আবারও কাফির হয়ে যেয়ো না। একে অপরকে হত্যা করো না। আমার অবর্তমানে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর কিতাব কুরআন রেখে যাচ্ছি। তোমরা যদি কুরআনের যাবতীয় বিধান শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো, তাহলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না।*

নবীজি আরও বলেন,

*হে লোকসকল, তোমাদের রব একজন, তোমাদের আদি পিতা একজন; তোমরা সবাই আদম আ.-এর সন্তান; আর আদম আ. মাটির সৃষ্টি। তোমাদের সে-ই সবচেয়ে অধিক সম্মানী, যে সবচেয়ে বেশি খোদাভীরু। (মনে রেখো,) কোনো আরব খোদাভীতি ছাড়া কোনো অনারবের ওপর শ্রেষ্ঠ হতে পারে না।*

*স্মরণ রেখো, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর দীন পৌঁছে দিয়েছি। হে আল্লাহ, আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি তাঁদের কাছে আপনার বাণী পৌঁছে দিয়েছি। তোমরা যাঁরা এখানে উপস্থিত, তাঁদের কর্তব্য হচ্ছে অনুপস্থিতদের মধ্যে এসব কথা পৌঁছে দেওয়া।*

হজ শেষে রাসুল আরও ১০ দিন মক্কায় অবস্থান করেন। এরপর মদিনায় ফিরে আসেন।

## সারিয়ায়ে উসামা ইবনু যায়েদ:

মক্কা থেকে ফিরে আসার পর ১১ হিজরির রাসূল ﷺ রোমানদের মোকাবিলার জন্য একটি সারিয়া বা বাহিনী তৈরি করেন। এ বাহিনীতি আবু বকর, উমর ও আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ রা.-এর মতো বড় বড় সাহাবি যুক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁদের উপস্থিতি সত্ত্বেও এই অভিযানের নেতৃত্ব তুলে দেওয়া হয় উসামা রা.এর হাতে। এটিই ছিল শেষ যুদ্ধাভিযান, যার সব ব্যবস্থাপনা খোদ রাসূল ﷺ আনজাম দেন। তবে বাহিনী রওনার আগে তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন। ফলে সাময়িকভাবে অভিযান মুলতুবি করা হয়। তাঁর ইনতিকালের পর আবু বকর রা. খলিফা হলে তিনি নবীজির আদেশমতো বাহিনী পাঠান।

## নবীজির ﷺ অসুস্থতা ও ইনতিকাল

১১ হিজরির সফর নবীজি ﷺ 'বাক্বিয়ে গারকাদ' কবরস্থান জিয়ারতে যান এবং কবরবাসীদের জন্য দুআ করেন। দুআয় তিনি বলেন, 'কবরবাসীরা, তোমাদের বর্তমান অবস্থা এবং কবরের অবস্থান কল্যাণকর হোক। কেননা, পৃথিবী এখন থেকে ফিতনার আঁধারে ছেয়ে যাবে।'

জিয়ারত শেষে ফেরার পর নবীজির ﷺ মাথাব্যাথা শুরু হয়। এরপর জ্বরও চলে আসে। বিশুদ্ধ বর্ণনানুযায়ী এই জ্বর ১৩ দিন স্থায়ী ছিল এবং এ অসুস্থতায় তিনি ইনতিকাল করেন। অসুস্থতার এ সময়ে তিনি প্রাত্যহিক নিয়মানুযায়ী স্ত্রীদের ঘরে যাতায়াত করেন। তবে অসুস্থতা যখন বেড়ে যায়, তখন স্ত্রীদের কাছ থেকে এভাবে অনুমতি নেন যে, অসুস্থতার দিনগুলো তিনি আয়েশা রা.-এর ঘরে থাকতে চান। ফলে সবাই তাঁকে অনুমতি দেন এবং তিনি আয়েশার ঘরে অবস্থান করতে থাকেন।

## আবু বকরের ইমামতি:

নবীজির ﷺ অসুখ ক্রমেই বাড়ছিল এবং একপর্যায়ে মসজিদেও যেতে পারছিলেন না। সে সময় তিনি আবু বকর সিদ্দিক রা.-কে নামাজের ইমামতি করতে নির্দেশ দেন। আবু বকর নবিজির জীবদ্দশায় প্রায় ১৭ ওয়াক্ত নামাজের ইমামতি করেন। ঘটনাক্রমে একদিন আবু বকর ও আব্বাস রা. আনসার সাহাবিদের এক বৈঠকের পাশ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন, তখন তাঁরা দেখতে পান উপস্থিত সবাই কাঁদছেন। কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে তাঁরা বলেন, 'আমরা নবীজির ﷺ মজলিসের কথা স্মরণ করে কাঁদছি।' আব্বাস রা. তাঁদের এই অবস্থার কথা নবীজিকে ﷺ জানান। তিনি তখন আলি ও ফাজল ইবনু আব্বাস রা.-এর কাঁধে ভর দিয়ে বাইরে বের হন। আব্বাস রা. তাঁর আগে আগে যাচ্ছিলেন। নবীজি ﷺ মিম্বারে উঠতে চাইলেও অসুস্থতার কারণে উঠতে পারেননি; প্রথম সিঁড়িতে বসে পড়েন। এ সময় তিনি উপস্থিত সাহাবিদের সামনে অলংকারপূর্ণ এক ভাষণ দেন।

## নবীজির ﷺ শেষ ভাষণ:

*হে লোকসকল, আমি জানতে পেরেছি যে, তোমরা তোমাদের নবীর মৃত্যুর ব্যাপারে ভয় করছ। তোমাদের জানা থাকা চাই, আমার আগে কোনো নবী কি চিরকাল থেকেছেন যে, আমিও থাকব? হ্যাঁ, আমি আমার মহান রবের সঙ্গে শীঘ্রই মিলতে যাচ্ছি এবং তোমরাও আমার সঙ্গে মিলিত হবে। তবে তোমাদের সঙ্গে আমার মিলনের স্থান হচ্ছে হাউজে কাউসার। অতএব, যে এটা পছন্দ করে যে, কিয়ামত-দিবসে সে হাউজে কাউসারের পানি দ্বারা পরিতৃপ্ত হবে, সে যেন আপন হাত ও মুখকে অনর্থক কাজ ও অপ্রয়োজনীয় কথা থেকে বিরত রাখে। আমি তোমাদেরকে তোমাদের মুহাজির ভাইদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার এবং মুহাজিররা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ থাকা ও সদাচরণের অসিয়ত করছি।*

নবীজি আরও বলেন,

*মানুষ যখন আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলে, তখন তাদের শাসকরাও তাদের সঙ্গে ইনসাফপূর্ণ আচরণ করে। আর যখন তাঁর নির্দেশ অমান্য করে, তখন তাদের শাসকরাও তাদের সঙ্গে কঠোর আচরণ করে।*

সংক্ষিপ্ত অথচ তাৎপর্যপূর্ণ এই ভাষণ প্রদানের পর রাসূল ﷺ ঘরে ফিরে আসেন। ইনতিকালের পাঁচ অথবা তিন দিন আগে আবারও তিনি ঘরের বাইরে বের হন। তখন তাঁর মাথায় পট্টি বাঁধা ছিল। মসজিদে তখন আবু বকর রা. যোহরের নামাজের ইমামতি করছিলেন। নবীজির আগমন টের পেয়ে আবু বকর পেছনে সরে আসতে থাকলে তিনি তাঁকে হাতের ইশারায় নিষেধ করেন এবং নামাজ চালিয়ে যেতে বলেন। এরপর তিনি আবু বকরের বাম পাশে বসে পড়েন। নামাজ শেষ হলে মুসল্লিদের উদ্দেশে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। তাতে তিনি বলেন,

*আমার প্রতি আবু বকরের অনুগ্রহ সবচেয়ে বেশি। আমি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আমার খলিল (বন্ধু) বানাতাম, তাহলে আবু বকরকেই বন্ধু বানাতাম; কিন্তু আল্লাহ ছাড়া যেহেতু আমার কোনো খলিল হতে পারেন না, তাই আবু বকর আমার ভাই ও বন্ধু।*

নবিজি আরও বলেন, *'আবু বকরের দরজা ছাড়া মসজিদে আর যত দরজা রয়েছে, সব বন্ধ করে দাও।'*

আল্লামা ইবনু হিব্বান রাহ. এ হাদিসটি বর্ণনার পর বলেন, 'এ হাদিসে স্পষ্টভাবে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নবীজির পর আবু বকরই খলিফা হবেন।

দিনটি ছিল সোমবার, সে দিন আবু বকরের ইমামতিতে লোকেরা ফজরের নামাজ পড়ছিলেন। এ সময় হঠাৎ করে রাসূল ﷺ আয়েশা রা.-এর কক্ষের পর্দা সরিয়ে লোকদের নামাজ পড়তে দেখে মুচকি হাসেন। আবু বকর রা. বিষয়টি টের পেয়ে পেছনে সরে আসতে লাগলেন। তখন আনন্দের আতিশয্যে সাহাবিদের মনও নামাজের মধ্যেই বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়।
এ অবস্থা দেখে নবিজি হাতের ইশারায় নামাজ চালিয়ে যেতে বলেন। এরপর তিনি পর্দা ফেলে ঘরের ভেতরে চলে যান। এ ঘটনার পর তিনি আর কখনো বাইরে বের হননি। সে দিন জুহরের নামাজের পর নবিজি দুনিয়ার এ জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে রাফিকে আলার সঙ্গে মিলিত হন। সহিহ বুখারির বর্ণনা অনুযায়ী তখন তাঁর করায় হয়েছিল ৬৩ বছর।

## নবীজির ﷺ শেষ কথা:

আয়েশা রা. বলেন, অসুস্থতার সময় নবীজি ﷺ কখনো কখনো চেহারা মুবারক থেকে চাদর সরিয়ে বলতেন, 'ইয়াহুদি ও খ্রিষ্টানদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ এ জন্য এসেছে যে, তারা তাদের নবিদের কবরকে সিজদার স্থান বানিয়েছে।' এটা বলার উদ্দেশ্য ছিল, মুসলিমরা যেন এ কাজ থেকে বিরত থাকে।

আফসোস! রাসূল ﷺ তাঁর জীবনের অন্তিমশয্যায় যেসব বিষয়ের ভয় করছিলেন, সেসব কাজ থেকে মুসলিমরা বিরত থাকেনি। অলি ও নেক বান্দাদের কবরসমূহকে তারা সিজদার স্থান বানিয়েছে।

আয়েশা রা. বলেন, মৃত্যুশয্যায় নবীজি আকাশের দিকে তাকিয়ে বলতেন, হে আল্লাহ, আমি ঊর্ধ্বজগতের বন্ধুকে পছন্দ করি।

নবীজির ﷺ ইনতিকালের সংবাদ যখন ছড়িয়ে পড়ে, তখন সাহাবিদের জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়। সবাই বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন। তাঁরা নবীজির ﷺ মৃত্যুসংবাদ আদৌ বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। উমরের মতো উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন আর শক্ত হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তি শোকের আতিশয্যে নবিজির ইনতিকালে বিষয়টি অস্বীকার করে বসেন। আবু বকর রা. তখন সেখানে গিয়ে সংক্ষিপ্ত একটি ভাষণ দেন। সে ভাষণে তিনি প্রথমে নিম্নোক্ত আয়াত তিলাওয়াত করে বলেন,

*'মুহাম্মাদ একজন রাসূলমাত্র। তাঁর আগেও বহু রাসুল গত হয়েছেন। সুতরাং তিনি যদি মারা যান অথবা নিহত হন, তাহলে কি তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে? এবং কেউ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করলে সে কখনো আল্লাহর ক্ষতি করতে পারবে না; বরং আল্লাহ শীঘ্রই কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করবেন।' [সুরা আলে ইমরান: ১৪৪]*

তোমাদের যারা মুহাম্মাদের উপাসনা করতে তারা শোনো, মুহাম্মাদ ইনতিকাল করেছেন। আর যারা আল্লাহর উপাসনা করতে তোমরা শোনো, আল্লাহ চিরঞ্জীব, তাঁর কখনো মৃত্যু হবে না।

সাহাবিরা তখন ধীরে ধীরে হুঁশে আসতে থাকেন। অনেকের মনে হচ্ছিল আয়াতটি এইমাত্র যেন নাজিল হচ্ছে।

নবীজির ﷺ ইনতিকালের পর প্রথম জরুরি কাজ ছিল, তাঁর খলিফা (প্রতিনিধি) নির্বাচন করা। কেননা, ধর্মীয় ও জাগতিক সব কাজকর্মে বিঘ্ন ঘটা এবং ভেতর ও বাইরের শত্রুদের আক্রমণের আশঙ্কা ছাড়াও নবীজির ﷺ কাফন-দাফনের ব্যাপারেও মতবিরোধের সমূহ আশঙ্কা ছিল। ফলে সাহাবিরা নবীজির ﷺ কাফন-দাফনের আগেই খলিফা নির্বাচনকে জরুরি মনে করেন। এ জন্য বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে কিছু সময়ও লেগে যায়। তাই সোমবার তিনি ইনতিকাল করলেও বুধবার পর্যন্ত কাফন-দাফনের কাজ মুলতুবি করা হয়।

মুহাজিররা তখন জড়ো হচ্ছিলেন আবু বকরের পাশে আর আনসাররা সাকিফায়ে বনু সায়িদায় সাআদ ইবনু উবাদার পাশে। আবু বকর বিষয়টি জানতে পেরে উমর ও আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহসহ নেতৃস্থানীয় কতিপয় মুহাজিরকে সঙ্গে নিয়ে পৌঁছে যান সাকিফায়ে বনু সায়িদায়। সেখানে পৌঁছার পর আলোচনার একপর্যায়ে আবু বকরের হাতে সবাই খিলাফতের বায়আত হন।

বুধবার রাতে আলি রা.,আব্বাস রা. এবং আরও কয়েকজন নবীজিকে ﷺ গোসল দিয়ে কাফন পরান। এরপর জানাজার নামাজ পড়া হয়। নবীজির ﷺ কবর আয়েশার রা. ঘরের সে স্থানটিতে খনন করা হয়, যেখানে তাঁর ইনতিকাল হয়েছে। আবু তালহা রা. নবিজির কবর খনন করেন এবং আলি ও আব্বাস প্রমুখ নবিজির লাশ মুবারক কবরে রাখেন। কবরটি এক বিঘত পরিমাণ উঁচু রাখা হয়।

# তথ্যসূত্র


সিরাতুন নবি
রেইন্ড্রপস সিরাহ
সিরাতে খাতামুল আম্বিয়া
উস্তাদের পিডিএফ